বোবা পাহাড়ের কান্না
ও
অন্যান্য গল্প

বোবা পাহাড়ের কান্না
ও
অন্যান্য গল্প

আবু সাঈদ খান

বোবা পাহাড়ের কান্না ও অন্যান্য গল্প ❖ আবু সাঈদ খান
প্রথম প্রকাশ ❖ ফেব্রুয়ারি ২০১১
প্রকাশক ❖ সৈয়দ জাকির হোসাইন ❖ অ্যাডর্ন পাবলিকেশন
২২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ। ফ্যাক্স : ৯৩৬২৯৪৯, ফোন : ৯৩৪৭৫৭৭, ৮৩১৪৬২৯
চট্টগ্রাম অফিস : ৩৮ এন. এ. চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম ৪০০০। ফোন : ৬১৬০১০
মুদ্রণ ❖ প্যানটোন কালার পয়েন্ট এন্ড এক্সেসরিজ, ১১/৩ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব ❖ শামীমা খান
প্রচ্ছদ ❖ আনিসুজ্জামান সোহেল
মূল্য ❖ একশত পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র

Boba Paharer Kanna ❖ Abu Sayed Khan
(Short Stories)
Published in February 2011
Published by Syed Zakir Hussain ❖ Adorn Publication
22 Segun Bagicha, Dhaka 1000, Bangladesh. Fax : 9362949, Tel : 9347577, 8314629
www.adornbd.com www.adornbooks.com e-mail : adorn@bol-online.com
Copyright : Shamema Khan
Cover design : Anisuzzaman Sohel
Price : Tk. 135.00.00 US $ 7 UK £ 5

ISBN-978-984-20-0196-3
ap-396-2011

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Adorn Publication.

উৎসর্গ

আ ন ম আবদুস সোবহান
অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক

গল্পসূচি

বোবা পাহাড়ের কান্না/ ৯
স্বপ্নভঙ্গ/ ১৭
হাসুর একাত্তর/ ২১
বিপ্লবের স্বপ্ন/ ২৭
রানুর গ্রামে ফেরা/ ৩৩
হাজেরা বিবি উপাখ্যান/ ৩৯
একজন কয়েদির আত্মহত্যা / ৪৬
পোতার মাটি/ ৫৪
শিল্পীর নিরুদ্দেশ যাত্রা/৫৮
ঈদের শাড়ি/ ৬৬

বোবা পাহাড়ের কান্না

বেশ ভারি চিঠি। আরিফ দ্রুত খামটি খুলে ফেলল। গোটা গোটা হরফে মৃত্তিকার লেখা। এমনই একটি চিঠির জন্য ৬টি বছরের প্রতীক্ষা। কতভাবে যে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে তা কেবল সে-ই জানে। অবশেষে মৃত্তিকা তার ডাকে সাড়া দিল!

সম্বোধনে কোনো আবেগ নেই। লিখেছে 'প্রিয় আরিফ'। এমনই ছিল সম্পর্কের সূচনা পর্বের সম্বোধন। পরে ও লিখত, 'আমার বৃষ্টি'। মৃত্তিকা বলত, মৃত্তিকার জন্য বৃষ্টির আর বৃষ্টির জন্য মৃত্তিকার জন্ম। ও আরও বলত, বৃষ্টিভরা মেঘের লাটাই আমার হাতে, ইচ্ছেমতো ঘোরাব—বুঝলে হে জনাব! উপমা দিয়ে কথা বলায় মৃত্তিকা পটু। এ সবকিছুই এখন আরিফের কাছে স্মৃতি, কেবলই স্মৃতি।

মৃত্তিকার কাছে আরিফ হয়ে উঠেছিল বৃষ্টি। পেছনের ভাবনা দূরে রেখে অবসরপ্রাপ্ত সচিবের একমাত্র ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আরিফ চৌধুরী চিঠিটির ওপর দ্রুত চোখ বুলাতে লাগল।

...তোমার কি মনে আছে—আমার সেদিন যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তুমি বললে, রাঙামাটি শহরেই যাবে, অসুবিধা কী! রাঙামাটির বাসায় গিয়ে দেখলাম, নানুর শরীরটা বেশ খারাপ। প্রায় ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে ওঠে– দেবা পারাক, দেবা পারাক [বজ্রপাত, বজ্রপাত]। আমার ছেলেদের মেরো না। ওরা পিতৃহারা।

তোমাকে বলেছি– নানুর বয়স যখন বিশ বছরের কম, আজু [পিতামহ] তখন বজ্রপাতে প্রাণ হারান। তারপর থেকে নানুই বাবা ও কাকাকে বড় করেছে। সে কী কঠিন জীবন সংগ্রাম!

পাহাড়ের গায়ে একখণ্ড জমিতে জুম চাষ করে সন্তান দুটির মুখের খাবার জোগাড় করতে হতো তাকে। কখনো পানির কলসি কাঁখে কখনো কাঠের বোঝা পিঠে চেপে দীর্ঘ পাহাড়ি পথে ছুটে চলতেন তিনি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবেই চলতো তার পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওঠা-নামার কসরত। এতে পরিশ্রমে তার মেরুদণ্ড বেঁকে গিয়েছিল। খরায় যখন জুম ক্ষেতের চারাগুলো শুকিয়ে যেত তখন তিনি ক্ষেতে পানি ছিটাতেন। আর তিনি আকাশের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতেন– ও দেবা ঝড় দ্যে, ঝড় দ্যে, দেবা পারাক ন ফেলেজ [আকাশ, তুমি বৃষ্টি দাও, বজ্র দিও না]। বৃষ্টি এলে তার চোখে দেখা দিত আনন্দের বন্যা।

বাবাকে দশ কি এগারো বছর বয়সে কাজের সন্ধানে ঘর ছাড়তে হলো। কাজ

জুটল রাঙামাটিতে এক সাহেবের বাসায়। লোকটি ভালো। আর পাঁচজন সাহেব থেকে আলাদা। গৃহশিক্ষক যখন তার ছেলেমেয়েকে পড়াতেন। বাবা মন দিয়ে তা শুনতেন। বাবার মনোযোগ দেখে সাহেব বই-খাতা কিনে দেন। এভাবেই তার বর্ণ পরিচয়।

বছর দুই পর সাহেবের বদলির আদেশ হলো। বাবা কাজ হারালেন। তবে তিনি বিদায়ের সময় বাবার হাতে তুলে দেন কিছু টাকা। সেই টাকা দিয়ে মুদির দোকান দিলেন বাবা। নিয়ে এলেন কাকাকেও। শুরু হলো দুই ভাইয়ের জীবনযুদ্ধ। একপর্যায়ে কাপড়ের ব্যবসা করে সুখের মুখ দেখলেন তারা।

জুম চাষ, ফসল না হওয়ার কষ্ট, বজ্রপাতের আতঙ্ক– কিছুই স্পর্শ করেনি আমাদের। আমরা ভাইবোনেরা ছিলাম এসব থেকে অনেক দূরে। আমার দুই ভাই আর আমি এবং চাচাতো এক ভাই ও এক বোন। তুমি জানো, পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে আমি সবার বড়।

মৃত্তিকার এসব বর্ণনার অর্থ খুঁজে পায় না আরিফ। এ তো বহুবার শোনা কাহিনী। আরিফ দ্রুত পড়তে থাকে–

...নানু শহরে থাকতে চাইতেন না। লোগাংয়ের এই পাহাড়ে ছিল তার সুখের নীড়। ছানাগুলো উড়ে যাওয়ার পর মা পাখির মতো বাসাটি পাহারা দিতেন তিনি। আমরা যখন লোংগা যেতাম, তখন নানুর যে কী আনন্দ! আমাদের বারবার বুকে জড়িয়ে ধরতেন। মাথায় হাত বুলিয়ে চুলগুলো এলোমেলো করে দিতেন। মুখে খাবার তুলে দিতেন। এসব কিছুতেই ছিল তার আনন্দের ধারা।

নানুর সেই স্মৃতিবিজড়িত লোগাংয়ের বাড়িটিতে আমরা কতবার গিয়েছি, সেখানে তখন আগের সেই জীর্ণ কুটির ছিল না। বাবা গড়ে দিয়েছিলেন ইটের ঘর। আমরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতাম, বন্য ফল পেড়ে কাড়াকাড়ি করে খেতাম। রাঙামাটির চেয়ে লোগাংই ছিল আমাদের পছন্দ। নানুর বারণ সত্ত্বেও আমরা বৃষ্টিতে ভিজতাম। নানু তখন একনাগাড়ে আওড়াতেন সেই জপমালা– ও দেবা ঝড় দ্যে, ঝড় দ্যে, দেবা পারাক ন ফেলেজ।

বজ্রপাত হলে নানু চিৎকার করে উঠতেন।

পাহাড়ে একদিন শুরু হলো রঙবেরঙের পোশাকের মানুষের আনাগোনা। আকাশে হাওয়াই জাহাজের ডিগবাজি। এসব দেখে তিনি আঁতকে উঠেছিলেন। বাবাকে বলেছিলেন, এ কিসের আলামত রে!

নানুর আশঙ্কাই সত্য হলো। সেদিন নানুর পাশে কেউ নেই। বিনা মেঘে বজ্রপাত। দ্রুম দ্রুম আওয়াজ। অগ্নিবৃষ্টি। নানু চিৎকার করছেন– ও দেবা...। কে শোনে তার আকুতি!

বাড়িঘর পুড়ে ছারখার। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কেবল অগণিত বাবা-মা-শিশুর নিথর দেহ। কত লোক মরেছে, কারা মেরেছে– কিছুই জানেন না তিনি। বোঝেন না রাজনীতির কুটিল তত্ত্ব।

লোগাং হত্যাকাণ্ডের পর বাবা-কাকা নানুকে জোর করে রাঙামাটিতে নিয়ে এলেন। সেখানে শুরু হলো তার বন্দিজীবন।

রাঙামাটির বাসায় এসে নানুর পাশে বসলাম। তার আধা-বলা, না-বলা কথা আমাকে আন্দোলিত করল। কল্পনায় বারবার ফিরে গেলাম শৈশব-কৈশোরের লোগাংয়ে, জুমক্ষেতে, ঝরনাতলায়। অনেক ভাবলাম। দু'দিন পর স্থির করলাম, আমি লোগাং যাব। মা-বাবা, কাকা-কাকী নিষেধ করলেন। আমি শুনলাম না। চাচাতো ভাই ধীমানকে নিয়ে লোগাং গেলাম।

বিধ্বস্ত লোগাং দেখে মনে হলো, এই আমার নানু মায়ের ঝলসে যাওয়া মুখ। আমার মাঝে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল। তারপর ফিরে এসে প্রতিজ্ঞা করলাম, নানুর মুখমণ্ডল যারা আগুন দিয়ে ঝলসে দিয়েছে, যারা তার সবুজ দেহে বলাৎকার করেছে, তাদের আমি ছাড়ব না। বদলা নেব। সেই থেকে আমি একজন শান্তিসেনা, গেরিলা।

আরিফ পড়তে পড়তে শিউরে ওঠে– কী কঠিন সিদ্ধান্ত! পরক্ষণে ভাবল, এমন সিদ্ধান্তের সময় তার পরামর্শ নেওয়ার কথা ভাবল না মৃত্তিকা। কী হবে ওর চিঠি পড়ে! এ ভাবনা ছেড়ে আরিফ আবার পড়তে শুরু করল।

...না, কখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মধুর ক্যান্টিন, রমনা পার্ক, কমলাপুরের বৌদ্ধ বিহারের মায়া ছাড়তে পারিনি। লোগাং আর রমনা পার্ক সর্বদাই আমার স্মৃতিতে একাকার। তবে আমি দ্রুত বদলে গেলাম। নিজেকে মানিয়ে নিলাম ভিন্ন এক জীবনে।

সারাদিন কাটে জুমচাষির পর্ণকুটিরে। রাতে বন্য শেয়ালরা যখন গুহা থেকে বেরিয়ে কেয়া হুয়া কেয়া হুয়া ডাকে, তখন আমি আর আমরা জেগে উঠি। হাতে তুলে নিই কাটা রাইফেল। তারপর পথ চলা।

আমার বুকে তখন নতুন সূর্যোদয়ের স্বপ্ন! ভাবি, সেদিন কবে আসবে, যেদিন পাহাড়ে আর গুলির শব্দ শোনা যাবে না, থাকবে না বারুদের গন্ধ। পাখিরা নির্ভয়ে বাসায় ঘুমোবে। ডানা মেলে আকাশে ডিগবাজি খাবে। গাছপালা, পাখ-পাখালি আর মানব-মানবীর কোলাহলে মুখরিত হবে লোগাং পাহাড়, অরণ্য, জনপদ। সেদিন আমি, আমরা আমাদের কাটা রাইফেল ছুড়ে ফেলে দেব। হাতে নেব ডুডুক-শিঙ্গা-হেঙগরঙ।

মাঝে মাঝে আমি খেই হারিয়ে ফেলি– কে শত্রু, কে বন্ধু? আমাদের বাড়ির পাশের আলেফ চাচা কি শত্রু? আলেফ চাচার মেয়ে শেফালি বিজু উৎসবে আমাদের সঙ্গে নাচত, গাইত। কী দারুণ গলা ছিল ওর! আমরা ঈদের দিন আলেফ চাচার বাড়িতে গিয়ে ফিরনি-পোলাও খেয়েছি। আলেফ চাচা, শেফালি আমাদের শত্রু?

আমি চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলি। বলি, কমরেড রবীন, পাহাড় কি কেবল চাকমা-মারমা-ত্রিপুরার? রবীন বলেন– না, আদি বাঙালিরও। তবে তারা কেন আমাদের এই কাফেলায় নেই? রবীনদা চাকমা-মারমা-ত্রিপুরা-বাঙালিসহ সবার সংহতির কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, আমরা স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে লড়ছি, আমাদের যুদ্ধ

তাদের বিরুদ্ধে– যারা অস্ত্রের ভাষায় কথা বলে। প্রশ্ন রাখি, তা কি আমরা আদি বাঙালিদের বোঝাতে পেরেছি?

তর্ক চলে। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়। আমি কখনও আশাবাদী হয়ে উঠি। ভাবি, একদিন শান্তির বারতা ঘোষিত হবেই। আবার হতাশ হয়ে পড়ি। হিসাব মেলাতে পারি না– এ উজান স্রোতে চলার শেষ কোথায়!

একদিন খবর এলো ঢাকায় এক সমাবেশের কথা। বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদ জানিয়েছেন, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকারের দাবির প্রতি সংহতি ঘোষণা করেছেন। আমি সেদিন আবেগাপ্লুত হয়ে উঠি। সংহতি সভায় আমার শিক্ষকেরা ছিলেন। আমি তাদের উদ্দেশে মাথা নোয়াই। আমি মিছিলে তোমার উপস্থিতিও অনুভব করি। অনেকদিন পর শুনেছি, পাহাড়ে শান্তি ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে তুমি আছো।

মনে হয়, কত যুগ ধরে তোমার সঙ্গে দেখা নেই, কথা নেই, তোমাকে কাছে পাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠি। ব্যাগ থেকে তোমার ছবি বের করে এক ধ্যানে তাকিয়ে থাকি। একদিন আশ্রয়দাতা গৃহকর্তার কিশোরী মেয়ে চম্পা ছবিটি হাতে নেয়। এরপর প্রশ্ন করে– এটি কার ছবি? তুমি বাঙালি ছেলের প্রেমে মজেছো নাকি? একনাগাড়ে কত কথা বলে যায়। দলের অনেকেই আমাদের সম্পর্কের কথা জানে। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। সৌজন্যের ধার ধারল না চম্পা। আমি হাসি।

আরিফের চোখে তখন মৃত্তিকার অস্পষ্ট ছায়া মূর্ত হয়ে ওঠে। সে বুকভরা তৃপ্তি নিয়ে আবার চিঠিতে দ্রুত চোখ বোলাতে থাকে।

...ঢাকার শান্তি আন্দোলনের ঢেউ পাহাড়েও আলোড়ন তোলে। তারপর শুরু হলো সরকার ও জনসংহতির মধ্যে বৈঠক। পাহাড়ে হেলিকপ্টার আসে, জনসংহতির নেতা সন্তু লারমাও খাগড়াছড়িতে আসেন অন্যদের সঙ্গে। ডাকবাংলোতে বৈঠকের পর বৈঠক। আমি আশায় বুক বাঁধলাম। প্রথম দফায় আলোচনা ব্যর্থ হলো। কিন্তু রুদ্ধ হলো না সংলাপের দ্বার।

একদিন আলপনা বলল– দিদি, যুদ্ধ শেষ হলে আমি তোমার মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মী আলপনা। শহরে সভা-সমাবেশ করে। ওর চাচার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল, সেদিনই পরিচয়। ও বলে, আমার বন্ধু সৌমিত্র লেখাপড়া ছেড়ে শান্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। ওকে কি তুমি জানো? ওকে আমায় লিখতে বলো। বলো, ও ঠিকানা দিলে আমি ওর সঙ্গে দেখা করব। আমি বুঝতে পারি সৌমিত্রের জন্য আলপনার মনের আকুতি। ওর আবেগ সংক্রমিত হলো আমার মাঝেও। আমি বদলে গেলাম। একজন যোদ্ধা পরিণত হলো ভালোবাসার কাঙাল নারীতে।

এর কিছুদিন পর খবর এলো, একটি মেয়েকে দুর্বৃত্তরা তুলে নিয়ে গেছে। এই সেই আলপনা, যার সঙ্গে এক সপ্তাহ আগেও কত কথা বলেছি! না, না, আমি একথা ভাবতে পারি না। ঢাকা-চট্টগ্রাম-রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি– সর্বত্রই প্রতিবাদের ঝড়।

একদিন ঢাকার একটি সংবাদপত্র হাতে এলো। দেখলাম, শহীদ মিনারের সমাবেশে বলা হয়েছে– এক আলপনা নিরুদ্দেশ, পাহাড়ে হাজারো আলপনা আতঙ্কে। আলপনাকে উদ্ধারের দাবি উঠল, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা বলা হলো। কিন্তু আলপনার সন্ধান মিলল না। একদিন প্রতিবাদে ভাটা পড়ল। আলপনা হয়ে রইল জুলুমবাজদের পাশবিকতার নির্মম এক উদাহরণ।

কত কথা জমেছে, কোনটা রেখে কোনটা বলি? শোনো, শান্তির সুবাতাস বইবে– এই স্বপ্ন নিয়ে প্রতিটি রাত পার করছি। কখনও হতাশ হয়ে কমরেড রবীনকে বলেছি– কাটা রাইফেলটি ফেরত নিন। ওটি আর বইতে পারছি না। অসহ্য হয়ে উঠেছিল অস্ত্রের ঝনঝনানি, বারুদের গন্ধ। অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র, রক্তপাত– এমন ভয়াল দৃশ্যের তখন যবনিকাপাত চাইছি। কেবল ভাবছি, পাখিরা কবে নীড়ে ফিরে আসবে, ছেলে-মেয়েরা নির্ভয়ে পথ চলবে, কবে ভরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় শেফালির হাত ধরে আমি নাচব, আলেফ চাচার বাসায় ফিরনি খাব। এক কমরেডকে আমার এসব কথা বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ঘুম না হওয়ায় দুঃস্বপ্ন দেখছেন। অনিদ্রাজনিত ঘোর। তিনি আমাকে ঘুমের ট্যাবলেট দিয়ে বলেন, এটি খেলে অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তা দু-ই দূর হবে। আমি রাগে-ক্ষোভে দাঁত কড়মড় করতে লাগলাম।

সৌমিত্র চাকমা ও আরিফ চৌধুরীকে আমি দেখতে চেয়েছি একই মিছিলে। সমতলবাসী ও পাহাড়িদের মধ্যে বিভাজনের যে দেয়াল গড়ে উঠেছিল, তার অবসান কামনা করেছি। কিন্তু আমার চাওয়ায় কী-ই বা আসে যায়!

১৯৯৬তে নির্বাচন। সরকার বদল। আবার শুরু হলো বৈঠকের পর বৈঠক। অনেক বোঝাপড়া-সমঝোতার পর শান্তিচুক্তি হলো। এই চুক্তিতে পাহাড়ের সব শান্তিকামী মানুষ খুশি। চুক্তিটি হাজারো যুবককে দিয়েছে ঘরে ফেরার সুযোগ। সীমান্তের ওপারের এবং দেশের ভেতরের শরণার্থীদেরও দেখিয়েছে নতুন স্বপ্ন। তুমি লিখেছো, এবার তোমারও ঘরে ফেরার লগ্ন।

তুমি তোমার প্রতীক্ষার কথা বলেছো। আমি তোমার কষ্ট বুঝি। কিন্তু বন্ধু, আমি যে বদলে গেছি, অনেক বদলে গেছি। আমি তোমাদের ভদ্র সমাজে বড় বেমানান। তাছাড়া এই পাহাড় আমার নানুর কোল। আমি কী করে সেই কোল ছেড়ে যাব?

আমি তো পাহাড়ের সহজ-সরল মানুষগুলোকে স্বপ্নের কথা বলেছি। এখন সেই স্বপ্ন পূরণের সময়। এই অসমাপ্ত কাজ ফেলে কোথায় যাব? এমন ভীরু কি তোমার মৃত্তিকা হতে পারে? না, তা তুমি চাও না, চাইতে পার না।

জানি, যত দূরেই থাকি না কেন, আমাদের ভালোবাসার বন্ধন কখনও ছিন্ন হবে না। আষাঢ়ে, শ্রাবণে যখন বৃষ্টি ঝরবে, আমি তখন তোমাকে স্মরণ করব। অতীত স্মৃতির মাঝে বেঁচে থাকব। এই কষ্টের ব্রত ভিন্ন আমার জন্য অন্য পথ খোলা নেই।

আমাকে নিষ্ঠুর ভেবো না। যে মৃত্তিকা ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ত, মধুর ক্যান্টিনে আড্ডা জমাত, টিএসসিতে কবিতা আবৃত্তি করত, রমনা পার্কে তোমার হাতে হাত

রাখত, সেই মৃত্তিকা তো আজ বেঁচে নেই। সে মরে গেছে। সে মৃত, ক্ষতবিক্ষত। তোমাকে তার দেওয়ার কিছুই নেই।

তবে শোনো। সেদিন মাঘী পূর্ণিমার রাত। দীঘিনালায় মুরং গৃহের মাচানে বসে এক নানুর সুরেলা কণ্ঠে গীত শুনছি। ফোকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে এমন সুর কী করে বেরোয় ভাবছি। মনে ভাসছে আমার নানুর মুখ। এমন সময় এক কমরেড একটি চিঠি দিলেন। বাবা লিখেছেন, তোমার নানু মৃত্যুশয্যায়; মাঝে মাঝে 'মৃত্তি মৃত্তি' বলছেন।

আমি বোরকা পরে দীর্ঘ পাহাড়ি পথ ডিঙিয়ে রাঙামাটির বাসায় এসে পৌঁছলাম। নানু আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তার চোখের জল পড়ল গড়িয়ে। আমি মুছে দিলাম। তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে চলে গেলেন। হয়তো ছুটে গেলেন লোগাংয়ে।

সারা বাড়ি কান্নায় ভেঙে পড়ল। নানুর মৃত্যুসংবাদ শুনে প্রতিবেশী স্বজনরা ভিড় করল।

বাবা বললেন– মৃত্তি, এ বাড়ি তোর জন্য নিরাপদ নয়। তাই আর দেরি করিস না, মা।

মনে পড়ে, যখন ঢাকা থেকে আসতাম, তখন বাবা আমাকে একদিন রাখার জন্য কী পীড়াপীড়িই না করতেন! শিশুর মতো বলতেন, আরেকটা দিন থেকে যা না, মৃত্তি! আজ সেই বাবা আমাকে দ্রুত বাড়ি ছাড়ার তাগিদ দিচ্ছেন। নানুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় থাকার ইচ্ছা আমার পূর্ণ হলো না।

কাজিনের পড়ার রুমে সন্ধ্যা পর্যন্ত বন্দি হয়ে থাকলাম। তারপর সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগে রাখা বোরকাটি পরে নিলাম। নানুর কাছে আর যাওয়ার সুযোগ হলো না। নিরাপদ দূরত্বে থেকেই বললাম– নানু, বিদায়।

পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। আমার গাইড তপন মং। ও বলল– দিদি, এখান দিয়ে কিছুক্ষণ আগে অপরিচিত লোক গেছে। দেখো না, দু'ধারের লতাপাতাগুলো গুটিয়ে আছে। আমি বললাম– তপু, বেশি সন্দেহপ্রবণ হয়ো না। ওকে সাহস দিলাম। কিন্তু মনে হলো, ধেয়ে আসছে এক ভয়াল থাবা।

চিঠি পড়তে পড়তে আরিফ আঁতকে ওঠে।

...হঠাৎ দেখি, কে বা কারা তপুর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমি কিছু বোঝার আগেই লোমশ হাত আমাকে জাপটে ধরল। আমার মুখ চেপে পাহাড়ি রাস্তায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল। চিৎকারও দিতে পারলাম না। পাকা রাস্তায় এনে আমাকে তোলা হলো একটি গাড়িতে। গাড়িতেই ওদের পৈশাচিক আচরণের শিকার হলাম। তারপর ওরা অজানা এক কুঠুরিতে আমাকে যখন ঠেলে দিল, তখন সবটুকু শক্তি সঞ্চয় করে বললাম, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করিনি...। ওরা দানবীয় হাসি হাসল। তারপর একেকজন দানব আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ওদের লোমশ হাত আমার দেহকে দলিত-মথিত, ক্ষতবিক্ষত করল। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলাম– প্রীতিলতার মতো সঙ্গে পটাসিয়াম সায়ানাইড রাখলাম না

কেন? আমি ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়লাম। হিম শীতলতা আমাকে স্পর্শ করল। মনে হলো, মৃত্যু আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

তারপর আর কিছুই জানি না। লোগাং পাহাড়ের ঢালে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিলাম। সেখান থেকে এনে এলাকার লোকজন আমাকে সেবা-যত্ন দিয়ে সুস্থ করে তোলে। খবর পেয়ে শান্তিবাহিনীর ক্যাম্প থেকে সতীর্থ বন্ধুরা এলো। আমি বললাম, আমি বাঁচতে চাই না। আমাকে বিষ দাও, আত্মহত্যা করব...।

তুমি বুঝতে পারছো, আমার হৃদয় সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মের কলিগুলো সব ঝরে গেছে। জীবনের সব আলো নিভে গেছে। আমার জীবনের আর কিছুই নেই, আছে শুধু আতঙ্ক। আমি এখন প্রতি রাতে ঘুমের ঘোরে নানুর মতো চিৎকার করে উঠি– ও দেবা ঝড় দ্যে, ঝড় দ্যে, দেবা পরাক ন ফেলেজ।

বন্ধু, আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না। আমি আমার ভালোবাসার মানুষটির জীবনকে কলঙ্কিত করতে চাই না। তোমার কি মনে পড়ে না– তোমার জুবাইদা ফুফুর কথা! তোমার কাছ থেকেই শোনা, কলেজছাত্রী ফুফুকে পাক হানাদার বাহিনী তুলে নিয়েছিল। নয় মাস ছিল নিরুদ্দেশ। তারপর এলো ১৬ ডিসেম্বর। সারাদেশে তখন বিজয়ের উৎসব। তোমাদের বাড়িতে স্বাধীনতার পতাকা উড়ছে। অনেকদিন পর ভালো রান্নাবান্না হয়েছে। তোমরা জুবাইদা ফুফুর জন্য দুঃখ করছো, কাঁদছো। তখন কে যেন দরজায় কড়া নাড়ল। এক ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে।

তুমি চিৎকার করে জুবাইদা ফুফু বলে তার কাছে ছুটে যেতে চেয়েছিলে। কিন্তু তোমার মা তোমাকে যেতে দিলেন না। তার পরের কাহিনী আরও হৃদয়বিদারক। তোমার বাবা জুবাইদা ফুফুর হাতে এক তোড়া ১০০ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললেন– 'যা, অন্য কোথাও গিয়ে কিছু একটা কর। তুই তো বুঝিস, তোকে ঘরে তুলে নিলে আমি সমাজে মুখ দেখাতে পারব না।' সেই না দেখা দৃশ্য এখনও আমার চোখে ভাসে, জুবাইদা ফুফু নোটগুলো তোমার বাবার মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিয়েছিলেন।

যিনি তার সমাজের দোহাই পেড়ে সহোদরাকে দূরে ঠেলে দিলেন, তিনি আরেক ধর্ষিতাকে ঘরে তুলবেন, পুত্রবধূর মর্যাদা দেবেন, তা কী করে ভাবো? এই কঠিন সত্যকে তুমি অস্বীকার করো না।

আমি জানি, তুমি বলবে, সেদিন তুমি ছোট ছিলে, তাই প্রতিবাদ করতে পারনি। এবার তোমার বাবাকে বাধ্য করবে। আমি জানি, সেটা হয়তো পারবে, কিন্তু ঘরে যে অশান্তির আগুন জ্বলবে, তা কে নেভাবে?

সে আগুনে জ্বলতেও রাজি ছিলাম। কিন্তু আমার যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। অনেক কাজ বাকি। শরণার্থীরা ফিরতে শুরু করেছে। তাদের ঘর তুলে দিতে হবে, জুম চাষের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ক্ষুধা, অনিদ্রা, আতঙ্কে অগণিত নর-নারী-শিশু অসুস্থ।

মৃত্যুপথযাত্রী। তাদের স্বাস্থ্যসেবা দিতে হবে। শিশুদের মাঝে জ্বালাতে হবে শিক্ষার আলো।

আমি জানি না, কবে, কখন এ বন্য জনপদে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি! লোগাং পাহাড় আর পাহাড়ি নর-নারীর মাঝেই আমি সুখের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছি। না, আমি এ পাহাড়, অরণ্য, ঝরনাতলা ছেড়ে অন্য কোথাও যাব না। কেন যাব? না, আমি আমার নানুর কোল ছেড়ে কোথাও যেতে পারি না, যেতে পারব না।

আমার কি আর আত্মসুখের চিন্তা করা সাজে? না, আমি তো আত্মসুখে বিভোর হতে পারি না। ভাবছি, নানুর মতো পাহাড়ে জীবনটা কাটিয়ে দেব, পাহাড়ের বুকেই চিরনিন্দ্রা যাব। ধমনিতে আমার নানুর, পূর্বপুরুষের রক্তধারা বইছে। আমি সেবা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, নানুর ভালোবাসার পাহাড়কে সুস্থ করে তুলব। কেবল প্রার্থনা করো এখানে যেন আর বজ্রপাত না হয়, আর যেন বুলেটের আওয়াজ না শোনা যায়।

আরিফের হাত থেকে চিঠির পাতাগুলো পড়ে পাহাড়ি শুকনা পাতার মতো উড়তে লাগল। এতক্ষণ সে কী শুনছিল? এ যেন বোবা পাহাড়ের কান্না! এক বীরাঙ্গনার সংগ্রামদীপ্ত জীবন ইশতেহার।

মৃত্তিকা এখন তার অচেনা, নতুন এক পথযাত্রী। সাধ্য কী তার ওই পাহাড়ি কন্যাকে ফিরিয়ে আনার!

স্বপ্নভঙ্গ

নগরীর এখন এক ভিন্ন চিত্র। রাস্তায় বাস-লরি, রিকশা-ঠেলাগাড়ির সংখ্যা কম। কেবল মাঝে মধ্যে ছুটে চলে মিলিটারি জিপ। জিপের ওপর সেনাসদস্যরা দাঁড়িয়ে থাকে ভয়াল মৃত্যুদূত হয়ে, মেশিনগানের ট্রিগারে হাত রেখে। শহরের নিস্তব্ধতা ভেঙে ক্ষণে ক্ষণে গুলির আওয়াজ শোনা যায়। গুলির শব্দ শুনলে সবাই আঁতকে ওঠে– কোথায় কী ঘটল! আগের মতো ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে স্কুল-কলেজে যায় না। শোনা যায় না ফেরিওয়ালাদের চিৎকার। অফিসার, কেরানি, পিয়ন, দোকানি সবাই সন্ধ্যা নামতেই ঘরে ফেরে। রাস্তার মোড়ে দোকানগুলোকে ঘিরে মহল্লাবাসীর যে আড্ডা চলত, চায়ের স্টলে রাজনৈতিক আলোচনার ঝড় উঠত; তা এখন বন্ধ।

মহল্লার দোকানিদের মধ্যে দু'জন দোকানে তালা ঝুলিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে গেছে। ভীতিকর এই পরিস্থিতির মধ্যেও বৃদ্ধ ফজর আলী আর জয়নাল এখনও দোকান খুলে বেচাকেনা করে। নারী-পুরুষ-শিশু সবাই নিজের নিজের মধ্যে গুটিয়ে আছে। ব্যতিক্রম নয় আড্ডাপ্রিয় সোলায়মান চৌধুরীও।

অশীতিপর এই উকিল বহুদিন আগেই আদালতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তার বাড়ির চেম্বারে আসত কয়েকজন জুনিয়র উকিল। সোলায়মান তাদের পরামর্শক। উকিলরা ব্রিফ নিয়ে চলে যাওয়ার পর রাত ৮টার দিকে শুরু হতো আড্ডা। সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিক, অধ্যাপক, ব্যবসায়ীসহ যারা আড্ডায় আসত, তারাও উধাও।

সোলায়মান এখন গভীর রাত পর্যন্ত ইজি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে থাকে। তারপর বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। কিন্তু ঘুমাতে পারে না। সারারাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে। জিপের শব্দে চমকে জেগে ওঠে। কখনও জেগে ওঠে আতঙ্কে।

আজ স্বপ্ন দেখেই সে চিৎকার দিয়ে উঠল। চিৎকারে প্রতিবেশীরাও জেগে ওঠে।

লতিফা বলল, বাবা, কী হয়েছে?

একটি দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম, বৌমা! একটি রাক্ষসমূর্তি তাপসকে ধাওয়া করছে।

আল্লাহ তাপসকে দেখবে।

আল্লাহ পরওয়ার দিগার, তাপসকে হেফাজত করো।

লতিফার চোখেও ঘুম নেই। দীর্ঘ সময় পড়ে থাকে জায়নামাজে। হাত তুলে বলে, হে রহমানুর রহিম, তুমি আমার তাপসকে সহিসালামতে রাখ।

ভোরে বিছানা থেকে চটজলদি উঠতে গিয়ে হোঁচট খেল সোলায়মান। অদ্ভুত স্বরে বলল, হায়রে নসিব।

কী হয়েছে বাবা?

গাড়ির শব্দ শুনেছ?

না, আমি তো অনেকক্ষণ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছি, কোনো গাড়ির শব্দ শুনিনি। তুমি ঘুমাওনি?

কোনো কথা বলে না লতিফা।

আর না। গ্রামের বাড়িতেই চল। আমার জ্ঞাতিভাই মহব্বতকে তো তুমি চেন। তোমাকে কি বলেছি, ও একটা চিঠি পাঠিয়েছে? লিখেছে– ভাইজান, বৌমাকে নিয়ে চলে আসেন। আমরা খেলে আপনারা না খেয়ে থাকবেন না।

কষ্টের হাসি হেসে লতিফা বলল, ওই চিঠিটা তো আমিই আপনাকে পড়ে শোনালাম, বাবা।

হ্যাঁ, তাই তো। আমার স্মৃতিশক্তিও লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

আপনি অতিরিক্ত টেনশনে ভুগছেন। এটা ঠিক না। তাপসকে আল্লাহ হেফাজত করবেন, ও বিজয়ীর বেশে ফিরে আসবে।

মা তাই হোক, তাপস গাজীর বেশে ফিরে আসুক। আচ্ছা মা, আমরা গ্রামে চলে গেলে তাপস যখন অস্ত্র নিয়ে গোপনে অপারেশন করতে আসবে, শেল্টার পাবে কোথায়?

ও লিখেছে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরই আমি দেখা করব। তার আগে বাড়ি ফিরব না।

হু, বড্ড বেয়াড়া নাতিটি আমার। এটা বংশের ধারা। ওই বয়সে আমিও আজাদি লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলাম। আর একই বয়সে কবির ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেল খেটেছে। প্রায়ই আমাদের বাপ-বেটায় তর্ক হতো। কবির বলত, বাবা তোমাদের পাকিস্তান আন্দোলন ছিল ভুল। আমি ওর সঙ্গে একমত হইনি। আজ বুঝতে পারছি, এটি ছিল মহাভুল। সেই ভুল শোধরাতে আমার বংশের একমাত্র প্রদীপ তাপস মুক্তিযুদ্ধে গেছে।

বাবা, ভোর হতে আরও দু'ঘণ্টা দেরি। আপনি ঘুমাননি, ঘুমিয়ে পড়ুন।

সোলায়মান আলো নিভিয়ে বিছানায় গেল। ঘুম আসছে না তার। পেছনের স্মৃতিগুলো এসে ভিড় করছে ক্রমাগত।

কৃষকের ছেলে সে। কত কষ্টে লেখাপড়া করেছে। স্কুলে মাসে চার আনা বেতন। বাবা দিতে পারতেন না। মা হাঁস-মুরগি পুষতেন। সে বাজারে ডিম, সবজি বিক্রি করে লেখাপড়ার খরচ জোগাত। মামারা ধনী ছিলেন, তাদের কাছ থেকেও সাহায্য পেত। তারপর ম্যাট্রিক পাস করে কেরানির চাকরিতে যোগ দেয়।

পরে চাকরি ছেড়ে কলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা, ইসলামিয়া কলেজে পড়াশোনা। তারপর ল' পাস করে ওকালতি। ওকালতি করে সম্পদও বানিয়েছে বেশ। তখন সন্তান দুটির দিকে নজর দিতে পারেনি। কেবল অর্থ আর সুনামের পেছনে ছুটেছে। তার স্ত্রী কোহিনূরের জীবন ছিল নিঃসঙ্গ। তবে মুখ ফুটে কিছুই বলত না। ছেলেমেয়ে দুটি নিয়েই কাটাত। ছেলেমেয়ের প্রাথমিক ভিত্তিটা গড়ে দিয়েছিল সে।

এক পর্যায়ে সোলায়মানও পরিবারকে সময় দিতে শুরু করল। কিন্তু কী এক অজানা রোগে কোহিনূর বিদায় নিল। তারপর ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে আর নতুন করে জীবন সঙ্গিনীর কথা ভাবেনি। নিজেই সন্তান দুটিকে মানুষ করেছে। তার চোখে ভাসে মেয়ে মমতাজের মুখ। মমতাজ এমবিবিএস পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে চারদিকে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল। তারপর কমনওয়েলথের বৃত্তি নিয়ে লন্ডনে এফআরসিএস করতে গিয়ে আর ফিরে এলো না। ওখানেই এক ব্রিটিশ সহপাঠীকে বিয়ে করে থেকে গেল। তাই কবির যখন ব্যারিস্টারি পড়তে যাবে তার আগেই তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। স্ত্রী লতিফাকে নিয়ে পড়তে গিয়েছিল কবির। দু'বছরের মাথায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল কবির। লাশ নিয়ে এলো মমতাজ ও লতিফা। সঙ্গে ছোট ফুটফুটে তাপস।

লতিফাকে বলেছিল, মা আমার বংশের প্রদীপ তাপসকে আমাকে দিয়ে দাও।

লতিফা অবাক করে বলেছিল, আমাকে আপনার পদতলে আশ্রয় দেবেন না?

সোলায়মান বলেছিল, মা, সেটি হবে আমার সৌভাগ্য। তবে তোমার জীবনের অনেক সময় পড়ে আছে, সে কথা ভেবে এমন প্রস্তাবের সাহস পাইনি। তুমি ভেবে দেখ। তবে আমার গৃহে তোমার অযত্ন হবে না।

মমতাজ তখন কাছে ছিল। লতিফাকে বলেছিল, ডোন্ট বি ইমোশনাল, বি প্র্যাকটিক্যাল।

কয়েকদিন পর মমতাজ ও লতিফা চলে গেল। লতিফা লন্ডনে একটি স্কুলে চাকরি করত। তিন বছরের কন্ট্রাক্ট। তার আগে চাকরি ছাড়ার সুযোগ ছিল না।

সত্যি একদিন লতিফা তাপসকে নিয়ে দেশে ফিরল। তারপর আঠারোটি বছর কেটে গেছে। লতিফা শ্বশুরের কাছেই আছে। এখন একটি কলেজে পড়ায়।

বাইশ বছরের তাপসই সোলায়মানের বন্ধু, যাকে বলে হরিহর আত্মা। দাদা-নাতিতে একসঙ্গে মর্নিংওয়াকে যায়। নাশতা খেয়ে পত্রিকা পড়ে। তারপর শুরু হয় গালগল্প, রাতে খাওয়ার পর আরেক দফা আড্ডা।

যখন দাদা-নাতিতে তর্ক হতো, নীরবে বসে তা উপভোগ করত লতিফা। বংশের ধারায় তাপসও ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিল। তুখোড় ছাত্রনেতা, তবে পড়াশোনায়ও সিরিয়াস।

যেদিন ইকবাল হলের নাম পাল্টে ফেলা হলো, সেদিন সোলায়মানের সঙ্গে তারেকের তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। সোলায়মান বলেছিল, কাজটি ঠিক হয়নি। উপমহাদেশের সভ্যতার দুই শিখা, ইকবাল আর রবীন্দ্রনাথ। তাদের সবকিছুরই ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। এখনও ইকবালের সেই কবিতা ভারতের অন্যতম ন্যাশনাল সঙ– 'সারে জাহাঁ ছে আচ্ছা ইয়ে হিন্দুস্তাঁ হামারা'।

কবি ইকবালকে আমিও সম্মান করি। কিন্তু পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ইকবালকে সমর্থন করতে পারি না। তাই আমরা পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে দেওয়া ইকবাল হলের নাম বদলেছে।

তর্কে পেরে উঠছিল না সোলায়মান।

সোলায়মান ইকবালের ভাবশিষ্য। আলিয়া মাদ্রাসা থেকে এফএ পাস করেছিল, যে কারণে আরবি-ফার্সি-উর্দুতে তার পাণ্ডিত্য। তবে মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেও তার দখল আছে। আদালতে আর্গুমেন্টের সময় ওমর খৈয়াম, ইকবাল, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করে জজদের তাক লাগিয়ে দিত। বক্তৃতার সময়ও তার কাব্যপ্রেমের প্রকাশ ঘটত।

সকালের আলো না ফুটতেই এবার সত্যি জলপাই রঙের একটি জিপ এসে বাড়ির সামনে থামল। লতিফা এসে অনুচ্চ স্বরে সোলায়মানকে জাগিয়ে দিল। দরজায় খটখট শব্দ করে ওরা সজোরে কড়া নাড়ল।

সোলায়মান লতিফাকে ভেতরের ঘরে যেতে ইশারা করল। দরজা খুলে দেওয়ার পর সেনারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজল পুরো বাড়ি। বলল, ইয়ে ঘারমে মুক্তি হায়?

নেহি নেহি।

তোমাহারা পোতা কাহাঁ হায়?

মালুম নেহি।

তোমহারা পাতা হ্যাঁয়, কাল তোমহারা পোতা ঘারমে আয়াথা। ও হামারা কনভয়মে অ্যাটাক কারাথা।

নেহি নেহি, সব ঝুট হায়।

তুম কালপ্রিট।

হ্যাঁ, হাম কালপ্রিট। হাম পাকিস্তান মুভমেন্টমে জয়েন কারকে গলদ কিয়া।

সোলায়মানের কোনো কথায় ওরা কান দিল না। সঙ্গিন উঁচিয়ে ট্রিগারে চাপ দিল। সোলায়মান লুটিয়ে পড়ল। গুলির আঘাতে ছিটকে সোলায়মানের বুকের ওপর পড়ল দেয়ালে ঝোলানো একটি মলিন ছবি। ছবিটি মহাকবি ইকবালের, যা সেই ত্রিশের দশকে আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র থাকাকালে সোলায়মান কিনেছিল।

রাজাকার নজু বলল, খতম হো গিয়া। পাকসেনারা কক্ষ ত্যাগ করল। হয়তো মনে করেছিল বুকে গুলি লেগেছে। কিন্তু না, গুলি তার হাঁটুতে লেগেছে। সেনাদের বিদায়ের পর ক্ষত ও যন্ত্রণা নিয়ে সোলায়মান উঠে বসল। বুকের ওপর থেকে ছবিটি হাতে তুলে নিয়ে বলল, হায় আল্লামা ইকবাল, এই তোমার স্বপ্নের পাকিস্তান? তোমার স্বপ্নের পাকিস্তানে এখন রক্তের নহর বইছে। ইকবাল, তুমি ভুল স্বপ্ন দেখেছিলে। তোমার স্বপ্নকে বুকে নিয়ে আমিও ভুল করেছি। এখন ভুলের কাফফারা দিতে হচ্ছে। শত ঝড়ঝাপটার মাঝে তোমাকে মাথার ওপর রেখেছিলাম, সেটিও আর পারলাম না। ইকবাল তুমি দেখ, বাংলার মানুষ নতুন এক মানচিত্রের স্বপ্ন দেখছে। তারপর পকেট হাতড়ে নাতির রেখে যাওয়া সবুজ জমিনে সোনালি মানচিত্রের ওপর রক্তে লাল সূর্য পতাকাটি উঁচিয়ে ধরে জীবনের সবটুকু শক্তি দিয়ে উচ্চারণ করল 'জয় বাংলা'।

হাসুর একাত্তর

বাড়িঘর, গাছপালা, খোলা মাঠে অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। সেই গাঢ় আঁধারের গায়ে হালকা আলো ছড়িয়েছে রাস্তার ঝুলন্ত ল্যাম্পগুলো। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির মধ্যে শরিফ উকিলের বাড়ির সামনের কদম গাছটি যেন বিরাট এক ছাতা হয়ে ফুটে আছে। গাছের নিচে মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাসু। ছায়ামূর্তির মতো দুই যুবক এগিয়ে আসছে। হিজলতলা দিয়ে মোড় নিতেই হাসু বলল, জয় বাংলা। যুবক দুটিও জয় বাংলা বলে হাসুকে অনুসরণ করল। হাসুর ইশারায় পূর্ব কোণের ঘরটিতে যুবক দুটি ঢুকল।

ঘরটিতে ভাড়াটিয়া ছিল। শহরে পাকবাহিনী আসার পর পরিবারটি সব ফেলে রেখে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে। ক'দিন আগে লোকটা কিছু কাপড়-চোপড় নিতে এসেছিল। তখন বলেছিল, দেশ স্বাধীন হলে ফিরবে। সে অনেকক্ষণ ধরে হাসু ও তার মাকে মুক্তিযোদ্ধাদের গল্প শুনিয়েছিল। তারপর নাসিমা বেগমের উদ্দেশে বলেছিল, খালাম্মা, দোয়া করবেন যাতে বিজয়ীর বেশে ফিরতে পারি।

তুমিও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছ?

নাসিমা বিস্ময়ভরে তাকিয়ে থাকে। এ বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পারে মকবুল।

আমি খোঁড়া মানুষ, তাই যুদ্ধে যেতে পারি না। তবে আমার একটা সুবিধা আছে। আমাকে কেউ সন্দেহ করে না। তাই শত্রুদের গতিবিধির খবরাখবর আমি এনে দেই।

আজ মকবুলকে মনে হয় ভিন্ন এক মানুষ। তারপর প্রশ্ন করে– তুমি কি রুনুকে চেন, আমার বান্ধবীর ছেলে?

হ্যাঁ, ও তো আমাদের ক্যাম্পে আছে। সারাদিন গান গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে রাখে। সাহসী ছেলে। কমান্ডার তাকে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট কী?

কাজ।

কী কাজ দিয়েছে?

তা বলা যাবে না, আপনি বুঝবেন না।

নাসিমা এখন বুঝতে পারে যে, মুক্তিযোদ্ধাদের সব কথা জানতে নেই।

তারপর মকবুল নাসিমার হাত ধরে বলে, খালাম্মা রুনু ১৪ আগস্ট রাতে শহরে ঢুকবে। তাকে একটু আশ্রয় দেবেন।

ও আমার ছেলের মতো। আমি না করতে পারব না। কিন্তু ওর কি শহরে আসা ঠিক হবে?

দেশের প্রয়োজনেই আসতে হবে।

হুম।

রুনু তার এক বন্ধুকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে শহরে ঢুকবে।

কী করবে?

শত্রুর ওপর হামলা চালাবে।

হাসুর বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু কিছুই বলে না।

–হাসু, তুমি আমার ঘরের চাবি রাখো। ওদের রাতে থাকতে দেবে। সম্ভব হলে ওদের কিছু খেতে দিও। হাসুকে ইমরান আড়ালে ডেকে বলে– খালাম্মাকে সবকিছু বলার দরকার নেই। বয়স্ক লোক ভয় পেতে পারেন।

হাসু মনে মনে ভাবে, রুনুর জন্য সে সব করতে পারে। রুনু তার মায়ের বান্ধবীর ছেলে। ওর ভাইয়ারও বন্দুক ছিল। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ছাত্র রাজনীতি করে। শহরে এলেই ওদের বাড়িতে আসে। রানু এলে ওর মা-ও খুশি হন। না খেয়ে যেতে দেন না।

রুনুর মুখে কথার খই ফোটে। সবই দেশের কথা, সংগ্রামের কথা। রুনুর কথা শুনে হাসুও দেশের মুক্তির স্বপ্ন দেখে। একদিন ও রুনুকে বলেছিল, আর একটি বছর। এরপর আমিও ভার্সিটিতে ভর্তি হবো। তখন সংগ্রামের মিছিলে আমাকে পাবে।

সে তো বটেই।

তোমাকে কেবল রাজনৈতিক সংগ্রামের মিছিলে নয়, তোমাকে..., কথার খেই হারিয়ে ফেলে রুনু।

আমতা আমতা করছেন কেন, কবি?

দূর, দু'চারটা কবিতা লিখেছি, তাতে কি কবি হয়?

তবে আপনি কী? অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল রুনু। হাসুর হাতটা হাতের মধ্যে পুরে বলল, জীবন-সংগ্রামেও তোমাকে ছাড়া ভাবতে পারি না। হাসু ওর হৃদয়ের কম্পন অনুভব করে।

এরপর রুনুকে নিয়ে তার নিত্যভাবনা, গোপনে কবিতা লেখা সবই চলছে। একটা কষ্ট হাসুকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, রুনু তাকে না বলে যুদ্ধে গেছে। সে কি বাধা দিত? মাঝে মধ্যে ভাবে, সেও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবে? সেদিন নাসিমা তাকে বলেছিল, তোকে নিয়েই আমার ভয়। তোকে ধর্মপাশায় তোর খালার বাড়িতে পাঠানোই ভালো। হাসু বলেছিল, মা আমার মুক্তিযুদ্ধে যেতে ইচ্ছে করছে। রুনুটা আমাকে না বলে একাই যুদ্ধে গেল।

রুনু আসবে– এ খবরে তার মনে ভয় ও আনন্দ দুই-ই কাজ করছিল। এখন ভয় কেটে গেছে।

রুনু ও তার বন্ধু ঘরে ঢুকে দেয়াল হাতড়ে খাটের ওপর বসল। হাসু ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে কাগজ দিয়ে মোড়ানো টেবিল ল্যাম্পটি জ্বালাল। সেই আলোয় চান্দুকে দেখল। রুনু পরিচয় করে দিল, চান্দু, হাসুর কথা তো তোমাকে বলেছি। হাসু হাত উঁচিয়ে সালাম দিল। চান্দু কিছুই বলল না।

রুনু বলল, চান্দু আমাদের গ্রুপের সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধা।

তার সহযোগিতাতেই চেয়ারম্যানকে আমরা খতম করেছি। হাসু আঁতকে ওঠে। কিন্তু কোনো কিছু বলে না।

টেবিলে রাখা খাবার খুলে দিয়ে হাসু বলে, মা উঠেছেন।

১৫ মিনিট আগে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছিল নাসিমা। ঘুম হচ্ছে না। গত আগস্টে সড়ক দুর্ঘটনায় বড় ছেলে রবিনের মৃত্যুর পর থেকে তার চোখে ঘুম নেই। রবিন আর রুনু সমবয়সী। তবে রুনুর চেয়ে এক ক্লাস উপরে পড়ত। ওরা দু'জন ছিল জানি দোস্ত।

হাসুর পিছু পিছু রুনু নাসিমার ঘরে ঢুকল। নাসিমা রুনুকে দেখে কেঁদে ফেলল। ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, রবিন থাকলে সেও মুক্তিযুদ্ধে যেত। হাসু বলল– মা, রুনু ভাইয়ার খাবার ওদের ঘরে দিয়ে এসেছি।

এখানে দে।

অন্য একজন আছেন।

তাহলে যাও, বাবা খেয়ে নাও।

খাওয়া শেষে রুনু বলল, খুব ক্লান্ত। আমরা একটু ঘুমিয়ে নিই। তুমি আমাদের রাত ১১টায় ডেকে দেবে।

হাসু ঘড়ির দিকে বারবার তাকাচ্ছে। ১১টা বাজার এক মিনিট আগে ঘর থেকে বেরুল। রুমের সামনে গিয়ে দেখল ওরা জেগে আছে।

একটি রিভলবার আর এক হালি গ্রেনেড নিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল। আজ ১৩ আগস্ট ১২টার পর পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। এই দিনে ওরা পাক হানাদারদের ওপর গ্রেনেড হামলা চালাবে।

তোমরা দু'জনই? হাসু প্রশ্ন করে।

না, আরও গ্রুপ আছে।

হাসু আর প্রশ্ন করে না। রুনু বলে– আমরা রাতে ফিরে আসতে পারি, না-ও পারি। পরিস্থিতি বলে দেবে, আমরা কী করব?

রাত ১২টা। 'দ্রুম দ্রুম' শব্দে কেঁপে ওঠে শহর। আবার একই আওয়াজ। কমপক্ষে বার দশেক গগনবিদারী আওয়াজে সবকিছু যেন ভেঙে-চুরে পড়ল। নাসিমা নিচু গলায় 'হাসু হাসু' বলে ডাকল। হাসুকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, এটি রুনুদের কাজ।

মনে মনে বলতে লাগল, 'আল্লাহ তুমি বিচ্ছুদের জানের হেফাজত করো। সবার মায়ের কোল পূর্ণ রাখো। আর জালেমদের দেশ থেকে দূর করে দাও। ওদের ওপর গজব নাজিল করো।'

নাসিমার মনে পড়ে শেখ মুজিবের কথা। বছরখানেক আগে কলেজের মাঠে যখন আওয়ামী লীগের জনসভা হয়েছিল, তখন তাকে দেখেছে দূর থেকে। সাদা ধবধবে পাঞ্জাবির ওপর হাতকাটা কালো কোট। হাতে পাইপ। সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল। তার আতঙ্কে আবারও বুক কেঁপে ওঠে। বিড়বিড় করে বলল, আল্লাহ তুমি মুজিবের ওপর নেক দৃষ্টি দাও। তার যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

নাসিমা ও হাসু সারারাত জেগে রইল। রুনুরা এলো না। সকালে নাসিমা বলল, হাসু, রুনুরা এখনও আসতে পারে। নাশতা বানিয়ে রাখ। মায়ের কথামতো রুনুদের জন্য খিচুড়ি রান্না করল।

সকালে একের পর এক টহল সেনাদের গাড়ি হুইসেল বাজিয়ে ছুটছে। শহর কিছুটা কর্মমুখর হয়ে উঠল। 'চাই মাছ, চাই মুরগি, চাই সবজি' বলে ফেরিওয়ালাদের ডাক শোনা গেল। কেউ কেউ শহরে যাচ্ছে। এমন সময় দুই যুবক লাকড়ির বোঝা মাথায় করে ছুটছে। হাসুদের পাশের বাড়ি থেকে একজন ডাকল, এই লাকড়িওয়ালা, এদিকে আসো। ওরা ভ্রূক্ষেপ না করে হাসুদের বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। লাকড়ির বোঝা নামিয়ে ডাক দিল, হাসু। হাসুর চোখ চড়কগাছ।

রুনু বলল, মিলিটারিরা আমাদের ঘিরে ফেলেছিল। আমরা চকবাজারের পেছনে লাকড়ির দোকানে আত্মগোপন করে বেঁচেছি। সকালে লাকড়ির বোঝা মাথায় টহল সেনাদের সামনে দিয়েই এসেছি। ওরা সন্দেহ করেনি।

হাসুর মুখে কথা নেই। সে ওদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। এদিকে মিলিটারিরা মুভ করেছে। আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করব।

দুপুরে রুনু ও তার বন্ধু শুয়ে আছে, হাসু রান্নায় ব্যস্ত। এমন সময় পাকসেনার গাড়ি এসে বাসার সামনে থামল। চুলায় ডাল রেখে হাসু দৌড়ে এলো।

–রুনু ভাই আপনারা যান, মিলিটারি আসছে। দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে কথা কটি উচ্চারণ করল হাসু।

ওরা বাড়ির পেছন দিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল। হাসু তাকিয়ে দেখল, ওদের রিভলবারটি বিছানায় পড়ে আছে। সে রিভলবারটি হাতে তুলে নিল। তারপর কামিজ তুলে পাজামার ফিতের সঙ্গে গুঁজে নিল। দুইজন সেনাসদস্য ঘরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। শুধু হাসুর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর জমির মুন্সীকে ইশারায় হাসুকে দেখাল। জমির মাথা নাড়ল। হাসু সব বুঝতে পারল।

মিলিটারিরা চলে গেলে জমির তার এক-দুই রাইফেলধারী সঙ্গীকে নিয়ে নাসিমার ঘরে ঢুকল। হাসু দাঁড়িয়ে আছে। বলল, আজ স্কুলে একটা ফাংশন আছে। মেজর সাহেব থাকবেন। হাসু সেখানে দুইখান গান গাইবে।

দেশকাল ভালো না। আমি মেয়েরে ছাড়ব না।

না ছাইড়া কী করবেন? দেশ যারা চালায়, তা গো বিরুদ্ধে যে কাজ করতেছেন তা কি জানি না। অল্পে ছোকরা দুইডারে নাগল পাইলাম না।

নাসিমা আঁতকে ওঠে।

হাসু বুঝতে পারে, এ থেকে নিস্তার নেই। তাই তাকে শেষবারের মতো ওদের মুখোমুখি হতে হবে। তারপর সে জমিরকে বাইরে বসতে দিয়ে মাকে বলে, মা এখন আর ওদের সঙ্গে কান্নাকাটি করে লাভ নেই; বরং কৌশল খাটাতে হবে।

কী কৌশল?

আপনি বুঝবেন না।

না, আমি বুঝব না, সব তোমরাই বোঝ।

হাসু মায়ের কাছে এক মিথ্যা গল্প ফাঁদল। বলল, মুক্তিযোদ্ধারা স্কুলের ওই ফাংশনে হামলা চালাবে।

তুই গোলাগুলির মধ্যে কেন যাবি?

না গেলে কি আমাকে ছাড়বে! তবে শোনো, যুদ্ধ শুরুর আগেই আমি কেটে পড়ব।

'হায় আল্লাহ! একি তোমার খেলা' বলে নাসিমা কাঁদতে লাগল।

মায়ের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও হাসু জমির মুন্সীর সঙ্গে যখন রওনা দিল, তখন সন্ধ্যা নেমেছে। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। কেবল দুটি রিকশা ছুটছে। একটিতে রাজাকার কমান্ডার জমির ও হাসু, অন্যটিতে রাইফেলধারী দুই রাজাকার।

পাড়ার প্রাইমারি স্কুল পেরিয়ে রিকশা ছুটছে।

হাসু বলল, জমির ভাই স্কুলে অনুষ্ঠান হবে না?

আরে না, সার্কিট হাউসে অইব। ও কথা না কইলে কি তোমার মা তোমারে আসতে দিত?

হুম।

রমিজ হাসুর গা ঘেঁষে বসল। তারপর হাসুর কাঁধে হাত রাখল। হাসু কিছুই বলল না।

তুমি খুব ভালা।

ভালোর কী দেখেছেন?

মানে?

আমি আপনারে ভালোবাসা দেব।

হেঃ হেঃ হেঃ

এরপর হাসু ডান হাতটা ঘুরিয়ে রিভলবারের ট্রিগারে হাত দেয়। আচানক রিভলবারের শব্দে জমির লুটিয়ে পড়ল। অন্য দুই রাজাকার রাইফেল ফেলে দৌড় দিল। তখন দুই রিকশাওয়ালা রাইফেল দুটি হাতে নিয়ে বলল, জয় বাংলা।

তখন হাসু বুঝতে পারল যে, তার রিকশার চালক চান্দু। আর পেছনের রিকশার চালক রুনু।

রুনু বলল, অহেতুক কেন গুলি খরচ করলে? আমরা তো ওকে গলা টিপে মারতে চেয়েছিলাম।

তারপর ওরা রিকশা দুটো ওখানে রেখেই মেঠো পথ ধরে ছুটতে থাকল। শহর ছেড়ে নদীর ধার দিয়ে ওরা ছুটছে, ছুটছে। ক্লান্তি নেই এই ছুটে চলায়।

বিপ্লবের স্বপ্ন

বিপ্লবের চোখে ঘুম আসছে না। ফ্ল্যাটের দরজা ভেজিয়ে সে তিনতলা পেরিয়ে ছাদে উঠল। রাতের আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ হাসছে। পটরানীকে ঘিরে তারকাদের সকৌতুক চাহনি। অন্য কোনোদিন হলে বিপ্লবও প্রকৃতির আনন্দমেলায় যোগ দিত, গুনগুনিয়ে গান গাইত। আজ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বিপ্লব আজ এক কঠিন সত্যের মুখোমুখি। বাড়িওয়ালা বিকেলে বাসা ছেড়ে দেওয়ার নোটিস দিয়েছে। অথচ এ বাড়িওয়ালা তাকে কত সমীহ করত। বলত সাংবাদিক বাবা। আর সে লোকটিই দুপুরে চোখ রাঙিয়ে বলল, ফুর্তিকরণের ইচ্ছা হলে হোটেলে যান, আমার বাড়িতে না। বিপ্লবও ধমকিয়ে বলেছিল, থামুন আজে-বাজে বকবেন না...। পরে ভাবল, উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই। রুকুর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা খুলে বলতে চাইল। কে শোনে কার কথা! বাড়িওয়ালা সাফ জানিয়ে দিল, মালসামান নিয়ে কেটে পড়ুন। আপনি সাংবাদিক– মানী লোক, তাই পুলিশে খবর দিলাম না। বাড়িওয়ালা অন্য দুই ভাড়াটিয়াসহ এসে যখন হম্বিতম্বি করছিল, তখন রোকেয়া বোবা কান্নায় ফুঁসছিল, চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রুধারা। অন্যদিন হলে ওরা মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলত, এভাবে কাঁদতে হয় না বুবু। কিন্তু আজ সে নির্বাক। কী সান্ত্বনা দেবে ওকে? কি করে দশজনের কাছে প্রমাণ করবে, রোকেয়া তার আদরের ছোট বোন।

বিপ্লব রায় ঢাকার দোহারের বনগ্রামের হেমচন্দ্র রায়ের পুত্র। তার বোন রোকেয়া বেগম! শুনলে যে কেউ তেড়ে আসবে। উত্তমমধ্যম দেওয়ার লোকের অভাব হবে না। সেদিক থেকে পুরান ঢাকার বাড়িওয়ালা রইস তরফদারকে ভালো লোকই বলতে হবে। নিরাপদে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে।

মেধাবী রিপোর্টার বিপ্লব। ৮ বছরের সাংবাদিক জীবনে সে অনেকবারই হৈচৈ ফেলে দিয়েছে। সে একবার এক প্রতিমন্ত্রীর দুর্নীতির কেচ্ছা-কাহিনী তুলে ধরে হুমকির মুখে পড়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীরই চাকরি যায়। সে থেকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদক হিসেবে তার খ্যাতি। তারপর কালোবাজারি সিন্ডিকেট, সচিবালয়ের দুর্নীতি, আন্ডারওয়ার্ল্ডের গোপন তথ্য ইত্যাদি ফাঁস করে দিয়ে বেশ নাম কামিয়েছে। সহকর্মীরা তাকে ঈর্ষার চোখে দেখে। তার কাজ সর্বদাই চ্যালেন্‌জিং, ঝুঁকিপূর্ণ তো বটেই। মাধবী শিউরে ওঠে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, কর্তব্য পালনে বাধা দেব না।

কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমার বড্ড ভয় হয়। বিপ্লব আজ তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিজের দিকেই মেলে ধরেছে।

১৯৭১ সালের মে। অন্য দশটি হিন্দু পরিবারের সঙ্গে তার মা-বাবা, জেঠা-জেঠিসহ নিকটাত্মীয়রা ভারতগামী এক কাফেলায় অগ্রসর হয়। এক ভরাদুপুরে ফরিদপুর জেলার শেষ সীমানা গড়াইপাড়ে সমাধিনগরে এসে শরণার্থী কাফেলা থামল। তখন গ্রামের নারী-পুরুষ-শিশু সবাই পালাচ্ছে। চারদিকে শোরগোল। পাকিস্তানি হানাদাররা নৌপথে এসে বাজারে আগুন দিল; দেখতে দেখতে সারা গ্রাম দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল। ওদের বেপরোয়া গুলিতে অর্ধশত নর-নারী প্রাণ হারাল, যাদের বেশির ভাগ প্রৌঢ়। সক্ষমরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যারা চলতে-ফিরতে পারে না এমন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাশবনে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। শিকারিদের দৃষ্টি এড়ায়নি, তাই কাশবনেও মেশিনগান দাগে। সেখানেই মৃত্যুর সংখ্যা ছিল অধিক। কেউ কেউ গুলির ক্ষতচিহ্ন নিয়ে বেঁচে যায়। তখন ৮ মাসের গর্ভবতী রেনুবালাকে সেই কাশবনে শুইয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন তার স্বামী হেমচন্দ্র।

মেশিনগানের গুলি রেনুবালাকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সে রেখে যায় এক নাড়িছেঁড়া ধন। হানাদার বাহিনী চলে যাওয়ার পর সংসারত্যাগী বাউল সানাই ফকির দুই শিষ্যকে নিয়ে সেখানে পৌঁছেন। ঘাতকদের বুলেটে ক্ষত-বিক্ষত লাশগুলোকে তারা অতি যত্নে পাক-সাফ করে হাতের কাছে পাওয়া লুঙ্গি-ধুতি-শাড়িতে পেঁচিয়ে মাটিচাপা দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছিল, হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষকে কি একই কবরে রাখা ঠিক? সানাই ফকির বলেছিলেন, সবাই একই মায়ের সন্তান, একই পথের যাত্রী। সেদিন লাশ টানতে টানতে এক শিশুর কান্নার শব্দে সবাই হতচকিত হয়ে উঠেছিল। তারা বিস্ময়ে দেখতে পান, রক্তাক্ত মায়ের বুকে এক শিশু গড়াগড়ি যাচ্ছে। সেই শিশুই আজকের বিপ্লব। শিশুটিকে কোলে তুলে সানাই ফকির নদী পার হয়ে কুষ্টিয়া জেলার কদমতলী গ্রামের নিঃসন্তান সাজু বিবির কোলে তুলে দিয়েছিলেন। ফকির বলেছিলেন, বেহেশত থেকে এই ফেরেশতা এসেছে। তোমার কোলে তুলে দিলাম। এ ধন তোমারই, তবে এর বাবা এসে কখনও সন্তানের দাবি করলে ফেরত দিবা। এই শর্তে সাজু বিবির পুত্রলাভ।

স্বাধীনতার পর তার বাবা হেমচন্দ্র সমাধিনগরে গণকবরের সামনে কয়েকবার এসে অশ্রুপাত করেছেন। শুনেছেন, এক নিহত প্রসূতির গর্ভ থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কাহিনী। কেউ বলেন, শিশুটি বেঁচে আছে। কেউ বলেন, ফকিরের হাতে পড়ে মারা যায়।

হেমচন্দ্র আনমনে প্রশ্ন করেন কোনটা ঠিক? আর কী করে বুঝবেন, সে তারই পুত্রধন না অন্য কেউ? এর জবাব হয়তো সানাই ফকিরের কাছে আছে। ফকিরকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছেন।

আরেকবার কলকাতা থেকে ফেরার পথে হেমচন্দ্র সমাধিনগরের গণকবরের পাশে গেলেন। একজন বললেন, ক'দিন হলো সানাই ফকির ঘুরে গেছেন। উনি বলেছেন, ছেলেটি এক মায়ের আদরে বড় হচ্ছে। লোকটি ফকিরের সন্ধানও দিল। বলল, লালনের মেলায় গেলে তার সাক্ষাৎ মিলতে পারে। তখন কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ায় চলছিল লালন মেলা। সেখানে হেমচন্দ্রের সঙ্গে ফকিরের সাক্ষাৎ মেলে। ফকির বলেন, আপনার স্ত্রীর বর্ণনা দিন। বর্ণনা শুনে ফকিরের উত্তর, হুবহু মিলে গেছে।

স্বাধীনতার বয়স কত? ১২ বছর, হ্যাঁ আপনার ছেলের বয়স এখন ১২। তারপর সানাই ফকির তাকে কুমারখালীর কদমতলী গ্রামের সাজু বিবির বাড়িতে নিয়ে যান। সাজু বিবির মাথায় বাজ পড়ল। তিনি বারবার মূর্ছা গেলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'ছাওয়ালডারে যখন কোলে নেই, তখন আমার বুকের মধ্যি চনচন করতে লাগল। ঘরে গিয়া দুধের বোঁটা ওর মুখে দিলাম। রোজই ও দুধের বোঁটা চোষে, কিন্তু দুধ না পাইয়া কান্দে। একদিন আল্লাহ ওর কান্দন শুনল। আমার বুকে দুধের নহর বইল। সেই দুধ খাওয়াইয়া ওরে বাঁচাইছি। আপনারা কন, আমার ছাওয়াল না হইলে আমার বুকে দুধ আসল ক্যান?' বিপ্লবের মনে আছে, সে কিছুতেই মাকে ছেড়ে আসতে চায়নি। মায়ের বুকে মাথা গুঁজে কত কেঁদেছে। অবশেষে সাজু বিবিকে ফকিরের দেওয়া শর্ত মানতে হলো। তবে তিনিও পাল্টা শর্ত দিলেন। তা হলো– স্কুল ছুটিতে, ঈদে, নবান্নে, মাঝেমধ্যে বিপ্লব তার কাছে আসবে, থাকবে। তবে বলতে ভুললেন না, ও যদি আমারে ভুইল্যা যায়, তবে আমার কথা নাই। সব মেনে নিলেন হেমচন্দ্র।

হেমচন্দ্র বলেছিলেন, ছেলে আপনারই থাকল। আমি শুধু ওকে ভালো স্কুলে লেখাপড়া করাতে নিয়ে যাচ্ছি। ক্লাস ফাইভের বৃত্তি পাওয়া চটপটে বিপ্লবকে বাড়িতে নিয়ে সনাতন ধর্মমতে যজ্ঞের আয়োজন করা হলো। নাম রাখা হলো অর্জুন চন্দ্র রায়। বিপ্লব তাতে খুশি হলো না। শেষ পর্যন্ত আপসরফায় ডাক নাম বিপ্লবই থাকল। এখন সে সাংবাদিক বিপ্লব রায় নামেই পরিচিত।

বিমাতার সংসারে বিপ্লবের আদর-যত্নের কমতি ছিল না। কিন্তু মনেপ্রাণে সে সাজু বিবির সন্তান হয়েই থাকল। ঈদ, শবেবরাতসহ বিভিন্ন পার্বণে সে কদমতলী ফিরে গেছে। ছুটি কাটিয়েছে মায়ের কাছেই।

ক'দিন আগে সানাই ফকিরের চিঠি এলো। তার মা শয্যাশায়ী। কাজের মধ্যে ডুবে ছিল বিপ্লব। যে মাকে ঘিরে তার কত স্বপ্ন, এতদিন তার খোঁজ নিতে পারেনি! সে আত্মপীড়নে দংশিত হতে লাগল। স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠল মায়ের মায়াভরা মুখ। ওর বাবার কথা মনে পড়ল। মৃত্যুর একদিন আগে বাবা তাকে ডেকে বলেছিলেন, যে ১২টি বছর তোমাকে কোলেপিঠে করে বড় করল সে অবশ্যই তোমার মা। তার প্রতি কর্তব্য পালনে কখনও অবহেলা কর না।

বিপ্লব কুষ্টিয়ার কদমতলীতে ছুটে যায়। রোকেয়া বলল, দাদা, মা শুধু আবোল-তাবোল বকে। বলে, 'আমার বিপ্লবকে গুণ্ডারা মাইরা ফ্যালাবি, কালোবাজারিরা ধইরা

নিবি।' কার কাছে শুনছে, তুমি ওদের বিরুদ্ধে নিউজ লেখ। তারপর থেকে তোমারে নিয়া মার যত চিন্তা। আমি বলি, ছেলে বড় হলে মায়ের কোলে শুইয়া থাকে নাকি? বিপ্লবের মনে আছে– তার বয়স যখন ১০ বছর, তখন রুকুর জন্ম। সানাই ফকিরই ওর নাম রেখেছিলেন রোকেয়া বেগম। বলেছিলেন, 'ও বড় হইয়া বেগম রোকেয়ার মতো শিক্ষার আলো জ্বালাবি।' লোকে তখন বলাবলি করত, এতদিন পর সন্তান, আল্লাহর কুদরত। ওর জন্মের পর বিপ-বের আনন্দ দেখে কে? ও যখন কদমতলী ছেড়ে দোহারের বনগ্রামে পিত্রালয়ে এলো তখন রুকুর খুব কষ্ট হতো। সেই রুকু এখন পাকা পাকা কথা বলে। সে কুমারখালী কলেজে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। বিপ-ব যখন তার মাকে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিল, তখন সাজু বিবি তার দেবরকে ডেকে বলল, 'ছোট মিঞা। ছাওয়াল তো আমারে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে যাবার চাইছে, তা তোমরা রুকুরে দেইখ। দেবর সলিম মিয়ার উত্তর, সে তোমার কইতে হবে কেন?

রুকু শিশুর মতো কান্না জুড়ে দিল। সে জিদ ধরল, সে মার সঙ্গে যাবে। বিপ্লব বলল, চলুক, আমি তো আছি। গ্রামের সরল লোকগুলোর মধ্যে রক্তের সম্পর্কহীন হিন্দু এক যুবকের সঙ্গে যাওয়া নিয়ে কোনো প্রশ্ন জাগল না। তারা সবাই সানাই ফকিরের ভক্ত। ফকির বলে, সবাই এক আদমের সন্তান।

বিপ্লব মাকে সরাসরি পিজিতে ভর্তি করে দিল। রুকু বলল, আমি মার কাছেই থাকি। বিপ্লব ভাবল, সেটিই ভালো। রুকু হাসপাতালে মায়ের সঙ্গেই থাকতে লাগল। তবে দুপুরে বিপ্লবের সঙ্গে বাসায় যায়। স্নান-আহার সেরে ফেরে। গতকাল দুপুরে দুই ভাই-বোন মেঝেতে বসে হাজির দোকানের বিরিয়ানি খাচ্ছিল। রুকু বলল, দাদা, আমি কাল দুপুরে এসে রাঁধব, তারপর আমরা ভাই-বোন একসঙ্গে বসে খাব। ঠিক আছে, না ভুল হয়ে গেছে। মাধবীদি, থুক্কু, বৌদিকে বলো, তিনজনে বসে খাব। কী মজা হবে! উভয়ের হাসিতে ঘর মুখরিত হয়ে উঠল।

মাধবী চক্রবর্তী ধনীর দুলালী, সুন্দরী, স্মার্ট। অঙ্কে প্রথম শ্রেণী পাওয়া মাধবী একটি এনজিওতে কাজ করছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের ডাক পড়বে, সেটি প্রায় নিশ্চিত। মাধবীর মতো মেয়ে তাকে কেন ভালোবাসে, একান্তে বিপ্লব এর জবাব খুঁজছে। সে একদিন মাধবীকে বলেছিল, আমার গায়ে মুসলমানের গন্ধ আছে, এটি জেনেও তুমি আমাকে ভালোবাসতে পার? ও মুখ ফুলিয়ে বলেছিল, তুমি আমাকে কতটুকু জান? আমার ঠাকুরদা কংগ্রেস করতেন, মামারা সব কমিউনিস্ট। পশ্চিমবঙ্গে আমার মার মেসতুতো ভাই সিপিএম করেন, এবার বিধানসভায় দাঁড়াবেন। বুঝলে, আমি পারিবারিকভাবেই জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠেছি। আমার মা রায় থেকে চক্রবর্তী হয়েছিলেন, আমি এখন চক্রবর্তী থেকে রায় হবো, এই আর কী!

বিপ্লব একবার মাধবীকে সানাই ফকিরের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। মাধবী তার কথায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিল, সত্যিকার মানুষ। মাধবী বিদায়ের সময় ফকিরের পা ছুঁয়ে

প্রণাম করেছিল। ফকির বাবার প্রতি মাধবীর এ বিনয়বোধ তাদের ভালোবাসাকে করেছিল আরও নিবিড়।

বিপ্লব স্বপ্ন দেখে। মাধবী, মা ও রুকুকে নিয়ে তার স্বপ্নের পাখা ডানা মেলে। কাসেম স্যার আর ফকিরবাবা তার স্বপ্ন নির্মাণের প্রেরণা। কাসেম স্যার, যিনি যৌবনে লাল ঝাণ্ডা হাতে লড়েছেন। তিনি বিপ্লবের কাহিনী শুনে বলেছিলেন, তুমিই হতে পার হিন্দু-মুসলিমের মিলনের দূত। ফকিরবাবা বলেন, উপরওয়ালা লালনের মতো তোকেও সমাজের আইল ভাঙতে পাঠাইছে। বিপ্লব মনে মনে ভাবে, মাধবী, মা, রুকুকে নিয়ে এক ছাদের তলায় বাস করব। বিশ্ব দেখবে, প্রীতির বন্ধনে গড়া এক পরিবার।

বিপ্লব ভাবে, তার পরিকল্পনায় মাধবী বাধা হয়ে দাঁড়াবে না তো? তা কী করে হয়! ও যখন মাধবীকে ফোন করে বলল, মা খুব অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় আনতে চাইছি। মাধবী বলল, এটি তোমার কর্তব্য। সেদিনও রোকেয়াকে ধানমণ্ডিতে মাধবীর অফিসে নিয়ে গিয়েছিল। তবে মাধবী তখন রোকেয়ার সঙ্গে যথেষ্ট সৌজন্য দেখিয়েছে। জানতে চেয়েছে, রুকু কী খাবে? ওর আপত্তি সত্ত্বেও চিকেন বার্গার এনে খাইয়েছে।

সেই মাধবীই আজ কপালে চোখ তুলে বলল, আর কত আদিখ্যেতা দেখাবে? ওই মেয়েটিকে নাকি বাসায় তুলেছ? তোমরা পুরুষজাত, সুন্দরী রূপবতী দেখলে তো মন গলে যায়। রোমান্স ঢেউ খেলে যায়!

এসব আবোল-তাবোল কী বকছ? তুমি তো জান ও আমার বোন।

কিসের বোন? সেই প্রবাদের মতো– 'গাছতলায় বিয়াইছে গাই, সেই সুবাদে খুড়াতো ভাই।'

বিপ্লব ওকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ পাওয়ার করুণ কাহিনী বলতে এসেছিল। তা বলার আগে মাধবীর নিক্ষিপ্ত তীর তাকে বিদীর্ণ করল। সে বুঝতে পারল তার জীবনের একাত্তর এখনও শেষ হয়নি!

সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেল। কঠিন বাস্তবতার কশাঘাতে বিপ্লব আজ বিধ্বস্ত। ওর চেহারা দেখে আঁতকে উঠেছিল বিউটি। বলল, বিপ্লবদা তোমার কী হয়েছে? বিপ-বও বিষয়টি কারও সঙ্গে শেয়ার করতে চাইছিল। সে অফিসের গেট থেকে সহকর্মী বিউটিকে মোটরসাইকেলের পেছনে বসিয়ে শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটে এলো। সে সব কথা খুলে বলল। বিউটি তাকে সান্ত্বনা দিল। বলল, তোমাকে আরও ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। আর রুকুকে নিয়ে ভেবো না। ও আমার বাসায় থাকবে। মা খুশি হবে। বিউটি শেষের কথাটি বলল, তোমার যে কোনো প্রয়োজনে আমাকে ডেক, পাশে থাকব। এর আগে একদিন বলেছিল, বিপ্লবদা আমি কি তোমার কোনো কাজে লাগতে পারি না?

মাধবীকে আজ মনে হয় দূরদ্বীপের এক বাসিন্দা! বরং বিউটি যেন অনেক কাছের। যাকে আরও কাছে টানা যায়। মেয়েটি অপূর্ব। মাধবীর মতো রূপসী নয়, শিক্ষাগত ব্যাকগ্রাউন্ড নয় অতটা উজ্জ্বল। তবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, অতি পরিশ্রমী। বড়দিনে ও বিপ্লবকে নিমন্ত্রণ করেছিল। ওর বাসায় গিয়ে দেখে ভিন্ন এক নারীমূর্তি। শ্বেত শুভ্র বসনে সজ্জিতা বিউটিকে মনে হয়েছিল, স্বর্গ থেকে নেমে আসা মা মেরী। বিপ্লব অস্থির হয়ে ওঠে। ডাক্তার বলেছে, মায়ের রক্তে ক্যান্সার ছাড়িয়ে পড়েছে, তিনি বাঁচবেন না। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, তারারা সব নিভে গেছে। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ। পুবাকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। সে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ঘরে ঢুকল। টেলিফোনটা তখন বেজেই চলেছে। ফোন ধরল, অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে বিউটির কণ্ঠ, আমি এখন পিজিতে মায়ের কাছে, মায়ের দেহ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। রুকু কাঁদছে। তুমি চলো আস।

রানুর গ্রামে ফেরা

ইটের রাস্তা দিয়ে ঝকর ঝকর শব্দ তুলে মোটরগাড়ি ছুটছে। ছেলেমেয়েরা রাস্তার ধারে বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে। কিছু ছেলে গাড়িটার পিছু নিয়েছে। ওরা জানে, গাড়িটি বোর্ড অফিসে গিয়ে থামবে। থামলে ওরা গাড়িটি ছুঁয়ে দেখবে। আর ড্রাইভারের চোখ ফাঁকি দিয়ে ধুলায় ঢাকা গাড়ির গায়ে নিজের নাম লিখবে। এ রাস্তায় হরদম ভ্যান-রিকশা চলে, কিন্তু মোটরগাড়ি তেমন চলে না। দৈবাৎ সরকারি কর্তা বা এমপি গাড়ি হাঁকিয়ে আসেন।

সব গাড়ির গন্তব্য বোর্ড অফিস, আসলে ইউনিয়ন পরিষদ অফিস। আগে নাম ছিল ইউনিয়ন বোর্ড। সরকারের খাতায় নতুন নামকরণ হলেও মানুষের কাছে বোর্ড অফিসই রয়ে গেছে। গাড়িটি এবার বটতলায় এসে থামল বোর্ড অফিসে যাওয়ার আগেই। বাড়ির আঙিনায় বসে নাতিপুতিদের সঙ্গে পারুল বিবি ধাবমান গাড়িটির দিকে চোখ ফেরাল। তার মনে হলো, হয়তো ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে, না হয় ইঞ্জিনিয়ার সাব রাস্তার কাজ ঠিকমতো হয়েছে কিনা তা দেখতে এসেছেন। হঠাৎ তার নাতি নবীন চিৎকার করে উঠল– দাদি দাদি, মেমসাহেব আমাদের বাড়িতে আসতেছে।

পারুল শাড়ির আঁচল দিয়ে চশমাটি মুছে দেখল, সত্যিই শাড়ি পরা এক মেম তাদের বাড়ির দিকে আসছে, তার পেছনে একপাল ছেলেমেয়ে। সঙ্গে বয়স্করাও মাস্টারবাড়ির পথ ধরেছে।

পারুল বিবি বকুলগাছের তলায় বাঁশের বেঞ্চিতে বসে প্রায়ই অতীতে ডুবে থাকে। আজও সে পুরনো স্মৃতির পাতা ওল্টাচ্ছে। এই বাড়ি এই ঘর– সবকিছুতেই তার স্বামী তসলিম মাস্টারের হাতের ছোঁয়া। সব ঠিকঠাক আছে, কেবল লোকটা নেই। সবাই তাকে ভুলে গেছে। কিন্তু সে কী করে ভোলে?

চলি-শ বছরের দাম্পত্য। কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি। তসলিম মাস্টার ছিলেন কবি। তার দুই-তিনশ' কবিতা ছিল, দুইটা খাতায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। ইচ্ছা ছিল, কবিতার বই বের করবে। কিন্তু সে সাধ পূরণ হলো না। অকালে তাকে চলে যেতে হলো।

মেয়ের মৃত্যুশোক তাকে শয্যাশায়ী করেছিল। কত ধুমধাম করে ভানুর বিয়ে দিয়েছিল। ছেলে ব্যাংকের ম্যানেজার। কিন্তু বাচ্চা হওয়ার সময় ভানু বলল, মা, আমি তোমার কাছে থাকব। পারুলও তা-ই চাইছিল। কিন্তু মাস্টার বলল, ও ঢাকাতেই

স্বামীর কাছে থাকুক, তুমি মাসখানেক আগে চলে যেও। তা-ই গিয়েছিল, কিন্তু বিধিবাম। হাসপাতালের বড় ডাক্তাররাও ভানুকে বাঁচাতে পারল না। তবে দুনিয়ায় স্মৃতি রেখে গেছে। ভানুর ছেলে তার চাচির কোলে বড় হয়েছে। এখন কলেজে পড়ে। ক'দিন আগে সে ঘুরে গেছে। অনেকক্ষণ সে পারুলের গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছিল।

পারুলের আজ মনে পড়ে অন্নপূর্ণার কথা। সে ও অন্নপূর্ণা এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে সরিষাকান্দি স্কুলে একই সঙ্গে পড়ত। পঞ্চম শ্রেণীতে ওঠার পর পারুলের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু অন্নপূর্ণা লেখাপড়া চালিয়ে যায়। ম্যাট্রিক পাস করে। অন্নপূর্ণার ইচ্ছা ছিল কলেজে পড়ার। সে সুযোগ পেল না। বাবা-মা বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগল।

পাত্রের সন্ধান দিয়েছিল তসলিম মাস্তার। নাম অমল চৌধুরী। সেকালের বিএ পাস। তসলিম মাস্টারের চেয়ে দুই-তিন বছরের ছোট। তসলিম প্রথমে অমলের দাদার কাছে অন্নপূর্ণার কথা বলেছিল। সে বলল, আপনি ঘটকালি করেন। পারুলও খুশি হলো। তসলিমের ঘটকালিতে একই গ্রামে অন্নপূর্ণার বিয়ে হলো, তবে পাড়া আলাদা। তখন পশ্চিম পাড়ায় কোনো মুসলমান বসতি ছিল না। অমল বাবুর সঙ্গে বিয়ের পর দুই বান্ধবীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়ে গেল।

একাত্তর সালে অমল চৌধুরী বউ আর একমাত্র মেয়ে রানুকে নিয়ে ওপারে রওনা দেয়। ক'দিন পর খবর আসে, সীমান্তের কাছের এক বাজারে অমল বউ-বাচ্চাকে রেখে খাবার আনতে গিয়েছিল। হঠাৎ সেখানে একদল পাকসেনা হাজির হয়। অমল আর্মি দেখেই দৌড় দেয়। একজন সেনা তাকে লক্ষ্য করে গুলি করলে সে লুটিয়ে পড়ে। তার মৃত্যুর পর শোকে বিহ্বল অন্নপূর্ণা ভারতগামী যাত্রীদলের সঙ্গে মিশে সীমান্তে পৌঁছে। অমলের দুই দাদা ও দিদিরা আগেই কলকাতা চলে গিয়েছিল। অন্নপূর্ণার দাদাও কলকাতায় নিবাস গড়েছিল '৪৭-এর আগেই।

স্বাধীনতার পর অমলের দাদা সপরিবারে ফিরে আসে। কিন্তু অন্নপূর্ণা তার মেয়ে রানুকে নিয়ে কলকাতাতেই থেকে গেল ভাইয়ের আশ্রয়ে। অমলের দাদার ছেলেরা কলকাতায় যাওয়া-আসা করত। তাদের কাছ থেকেই পারুল, অন্নপূর্ণা ও রানুর খবর পেত। অন্নপূর্ণার দুই-তিনখানা চিঠিও পেয়েছিল পারুল। লিখেছিল, ও বেড়াতে আসবে। স্বামীর ভিটা তাকে টানছে। পারুলও দেশের খবর জানিয়ে অন্নপূর্ণার কাছে চিঠি লিখেছে। সেই চিঠি অন্নপূর্ণার ভাশুরের ছেলেদের কাছে দিত। ঠাট্টা করে বলত, জবাব না নিয়ে এলে ঠ্যাং ভেঙে দেব।

তারা অন্নপূর্ণার কাছ থেকে চিঠি এনে পারুলকে দিত। কখনও খুলে দেখেছে বলে পারুলের মনে হয়নি। পারুলের বিশ্বাস, মৃত্যু না হলে অন্নপূর্ণার সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকত। ১৯৮০ সালে অন্নপূর্ণার মৃত্যুর খবর আসে। সে খবরে পারুলের নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এলাকার লোক বলত, ভিন্ন ধর্মের সইয়ের মধ্যে এমন বন্ধুত্ব আর কখনও দেখেনি কেউ। তখন তসলিম মাস্টার বেঁচে ছিলেন।

এর বছরখানেক পর মহাধুমধাম করে ভানুর বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে অন্নপূর্ণার ভাশুরের দুই ছেলে এসেছিল। পারুল বলেছিল, অনুপা বেঁচে থাকলে ও কলকাতা থেকে না এসে পারত না। ভানুও রানু ও অন্নপূর্ণার জন্য চোখের জল ফেলেছিল। ওরাও দু'জন ছিল বান্ধবী। ওদের নামের মিলও ছিল। সবাই বলাবলি করত, দুই সই মিলিয়ে মেয়ের নাম রেখেছে নাকি!

একাত্তরে একইসঙ্গে তালতলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ত রানু ও ভানু। দিনে কয়েক ঘণ্টা একই সঙ্গে থাকত। পূজায় অমল বাবু ভানুকে ফ্রক কিনে দিত, ঈদের সময় তসলিম মাস্টারের দেওয়া ফ্রক পরে রানু পারুল মাসির বাড়িতে আসত। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে একটা গুঞ্জন ছিল, তসলিম মাস্টারের বাড়িতে এসে অমল বাবু নাকি গো-মাংস খেয়েছে, আর তসলিম মাস্টারের পাতে ভাত তুলে দিয়েছিল অনুপা দেবী, যা ওই বাড়ির রাখাল ছেলে স্বচক্ষে দেখেছিল। কিন্তু যাদের নিয়ে কথাবার্তা, সেই অমল বাবু ও তসলিম মাস্টার এসব আমল দিত না। এসব কথা শুনে পারুল মন খারাপ করে বলেছিল, তুমি কেন ওদের বাড়িতে খেতে গেলে?

তোমার সই এত করে বলল।

তসলিম মাস্টার নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করে বলত, 'ছুঁইলে তোর জাত যাবে/জাত তো নয়, ছেলের হাতের মোয়া/হুকার জল আর ভাতের হাঁড়ি/এই তো ভাবলি জাতির প্রাণ/তাই তো বেকুব এক জাতিকে করলি একশ খান।' এ কবিতা যে তসলিম মাস্টার কতবার বলেছে, শুনতে শুনতে পারুলের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

এসবই আজ স্মৃতি।

দুই-তিনটি ছেলে দৌড়ে এসে পারুল বিবিকে বলল, মেমসাহেব নেমে আমাগো কাছে জিগাইল তসলিম মাস্টারের বাড়ি কোনটা? কইলাম, মাস্টার দাদা মারা গেছে। মেমসাহেব কইল, তার বাড়ি দেখায় দাও।

আরেক ছেলে বলল, মেমসাহেব ভানু ফুফুর কথাও জিগাইল। আমি কইছি, ভানু ফুফুও মরে গেছে। মেম কয়, ভানুর মা কেমন আছেন? আমি কইছি ভালো, তয় বেশি চলাফেরা করবার পারে না। পারুল ভাবে, মাস্টার সাহেবরে তো দেশ-বিদেশের কতজন চিনত। তাদের কেউ হবে। কিন্তু কোনো মেমসাহেবকে তো চিনত না!

ছেলের বউরা একটু আবডালে গেলে পারুল বিবি নাতি-নাতনিদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আগন্তুক মেমসাহেবকে দেখতে লাগল। মেমসাহেব তো তার কাছেই আসছে। কাছে এলে তাকিয়ে দেখে আসলে মেম নয়, বাঙালিই, খুবসুরত এক মেয়ে। তার সই অনুপার চেয়েও ফর্সা। সে শুনল, ছেলেরা তাকে দেখিয়ে বলছে, ওই যে ভানু ফুফুর মা। পারুল বলল, আপনি কে? মেয়েটি কোনো উত্তর না দিয়ে পারুলের পায়ে হাত ছুঁয়ে তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'মাসিমা, আমি তোমার রানু।'

রানুর সব খবর পারুল রাখে। কলকাতায় মামাদের কাছে রানু বড় হয়েছে। সে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। বিয়ে হয়েছে এক বিরাট চাকুরের সঙ্গে। ছেলের বাড়িঘর বিলাতে। কিন্তু রানু চাকরি করে আমেরিকায়।

জাতিসংঘের একটি প্রকল্পে চাকরি করে রানু। ঢাকায় এসেছে বাংলাদেশের কয়েকটি প্রকল্প সরেজমিন দেখতে।

অ্যাঁ, রানু, অনুপার মেয়ে তুই? আমি কি স্বপ্ন দেখছি! কতকাল পথ চাইয়া আছি। মনে মনে ভাবছি, এ জন্মে তোর দেখা কি পাবো না?

তুমি কেমন আছো মাসি?

এই বয়সে কি ভালো থাকার জো আছে, চোখে কম দেহি। বাতের ব্যথা, তারপর দুইডা মরার শোক আমারে শেষ কইরা দেছে। যমরে কই, আমারে নেও না ক্যান?

পারুল তার স্বামী ও কন্যার মৃত্যুর ঘটনা বলল। তারপর বলল, তোর বাবা কইছিল, দেশ স্বাধীন হইলে বাড়িতে দোতলা দালান দিবি। বাঁইচা থাকলে দিত। পশুরা তারে মাইরা ফেলাইল। সেই শোকে তোর মাও চইলা গেল। আমার কুটিকালের সই। আমরা ছিলাম একজন আরেকজনের জানের জান। আমার আত্মার আত্মীয়রা একে একে সবাই চলে গেল। আল্লাহ আমারে বাঁচায় রাখছে কান্দাইতে।

চোখের চশমা মুছে বলল, অনুপা তাকে লিখেছিল, রানু বড় হলে ওকে বিয়ে দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসবে। হায় কপাল! রানু এতবড় শিক্ষিত হইছিস, অনুপা দেইখ্যা যাবার পারল না।

ওসব কথা থাক মাসি।

রানু পারুলের ছোট ছেলের বউকে নিয়ে তাদের বসতভিটা ঘুরে এলো। বাড়িটি রানুর জেঠাত ভাইরা '৮২ সালে বিক্রি করে দিয়েছে। ওরা দুই ভাই লন্ডন চলে গেছে। এক ভাই আছে ঢাকায় থাকে। পারুল বলল, ওদের বলেছিলাম বাড়িটা তোগো চৌদ্দ পুরুষের বসতি, বেচিস না। কিন্তু শুনল না।

ভিটা ঘুরে আসার পর পারুলের পীড়াপীড়িতে ড্রাইভার, ঢাকা থেকে জাতিসংঘের এক জুনিয়র কর্মকর্তাসহ রানু এই বাড়িতে দুপুরের খাবার খেল।

তারপর পারুলের ঘরে তার খাটে এসে বসল। পারুলের নির্দেশে তার সামনে ডজনখানেক খোসা ছড়ানো নারিকেল, বেল ও শরিফা নিয়ে হাজির হলো মেজবউ।

পারুল বলল, এগুলো মিষ্টি নারিকেল। এই নারিকেল অনুপাও পছন্দ করত। তারপর কয়েকটা শরিফা দিয়ে বলল, এটি তোদের বাড়ির শরিফা, গাছের বীচি থেকে মাস্টার লাগাইছিল, কয়েকটা গাছ হইছে। খুব ধরে। নিজেরা খাই, পাড়াভরে বিলাই। পারুলের দেওয়া ফল-ফলাদির কয়েকটা বেছে রানু প্যাক করতে বলল। বলল, মাসি এগুলো ঢাকায় আমার কলিগদের খাওয়াব। তোমাদের জামাই ও নাতনি এগুলো পেলে খুব খুশি হতো।

জামাই বাবা আর আমার দিদিমণিরে লইয়া আরেকবার জ্যৈষ্ঠতে আইস। তোর মা নাই, আমি তো আছি। আমিই জামাইষষ্ঠী করব।

মাতৃস্নেহের পরশে রানুর চোখে জল এলো। রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। রানু প্যাকেট খুলে একটি শাড়ি বের করে বলল, মাসি, তোমার জন্য কিনেছি।

আমেরিকা থেকে কিনছিস? ওখানে মেয়েরা শাড়ি পরে?

না, গেল পূজায় কলকাতায় গিয়েছিলাম। সেখান থেকে কিনেছি।

রানু শাড়িটা পারুলের বুকের ওপর মেলে ধরলে পাশে পারুলের ছোট ছেলের বউ বন্যা বলল, মাকে খুব মানাবে।

অশ্রুসিক্ত পারুলও হাসল। পারুলের কথা শেষ হয় না। রানু বলল, মাসি আরেকবার সময় করে আসব।

পারুল পাশের সিন্দুক খুলে ভারী একটা পুঁটলি বের করল। পাশে দাঁড়ানো দুই পুত্রবধূর চোখ ছানাবড়া। তারা শাশুড়ির সোনা-গহনার ভাগ পেয়েছে। তবে সিন্দুকে আরও কিছু আছে, তা আন্দাজ করত। সেই গুপ্তধন একজন অনাত্মীয়া মেয়েকে দিয়ে দেবে, তা ভাবতেই পারেনি তারা। বলল, তোর মায়ের একটা জিনিস আমার কাছে আছে। তোরে কি কইছিল?

না, এমন কিছু শুনিনি তো।

রানু ও পুত্রবধূরা তাকিয়ে আছে। বড় ছেলে মুসা বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে। বস্তুটির ওপর থেকে কয়েক পরত কাগজ খুলে ফেলল। তারপর স্পষ্ট হয়ে উঠল একটি মূর্তির অবয়ব। কাপড়ের প্যাঁচ খুলতে খুলতে পারুল বলল, এটি শ্বেত পাথরের গণেশ। অনুপাকে তোর দাদু দিছিল। বাবার স্মৃতি খোয়া যেতে পারে, সেই ভয়ে ইন্ডিয়ায় যাওয়ার সময় সাথে নেয় নাই। আমারে কইল, সই দেশে ফিরলে নেব। তোর মার মৃত্যুর খবর যখন শুনলাম তখন ভাবলাম, তোর কাছেই ওটা দেব। একবার ভাবছিলাম, তোর জেঠাত ভাইদের কাছে দিই। দামি জিনিস! সাহস করলাম না। তোর মা মরার পর আমি একখানা চিঠি তোরে দিছিলাম। লিখছিলাম, তোর মার একটি স্মৃতি আমার কাছে আছে। বেশি ভাইঙ্গা লিখি নাই।

চিঠির কথা মনে আছে। কিন্তু কী লিখেছিলে মনে নেই। আর চিঠির উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থা আমার ছিল না।

তাই হয়। এতবড় শোক সামলাবার শক্তি উপরঅলাই তোরে দেছে।

আমি মরে গেলেও তুই এটি পাইতি। ছোট ছেলেরে আমি শপথ পড়াই কইছি, আমি মরে গেলে এটি রানুরে দিবি। ও ধর্মকম্ম করে না, তবে নীতিবান।

রানু বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। বাকরুদ্ধ। মায়ের এই স্মৃতি জড়ানো গণেশ মুহূর্ত তার কাছে অতুলনীয়। কিন্তু কোনো কিছুর সঙ্গেই তুলনা হয় না বাংলার এক অতি সাধারণ নারীর, যার মধ্যে দুর্লভ এক মানবিক গুণের সে সন্ধান পেল।

ধুলায় ধূসর রাস্তায় রানু ছুটছে আর ভাবছে। কলকাতা, ঢাকা, লন্ডন, নিউইয়র্ক, জেনেভা কত নগরী সে ঘুরেছে। ডাকসাইটে আমলাদের সঙ্গে তার ওঠাবসা। রাজনীতিকদের সঙ্গে কথাবার্তা। লোভ আর স্বার্থের বেড়াজালে বন্দি সবাই। নিজ পিতৃভূমি তালতলীতে না এলে এমন নির্লোভ নীতিবান মানুষের সাক্ষাৎ কি মিলত। কী বিস্ময়কর ঘটনা, ৩৫টি বছর ধরে পরম যত্নে বান্ধবীর স্মৃতি আগলে রেখেছে এক নারী! আর বিশেষ কিছু ভাবতে পারছে না রানু। চোখ বারবার অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছে তার।

হাজেরা বিবি উপাখ্যান

খুলনা শহরের সুন্দরবন রোডের বনফুল ভিলা। পথ চলতেই দৃষ্টি কাড়ে সবার। শহরের এই অভিজাত এলাকায় এমন দৃষ্টিনন্দন ও বিশাল বাড়ি আর দ্বিতীয়টি নেই। যেন বাগানবাড়ি। গাছগাছালি, লতা-পাতায় ঘেরা বাড়িটির মাঝখানে লাল ইটের তিনতলা ভবন। পূর্বকোণে কাজের লোকদের থাকবার জন্য কয়েকখানা টিনের ঘর। সেগুলোতেও লাল রঙের প্রলেপ।

বাড়ির মালিক রুবেল চৌধুরী অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। ব্যবসায়িক কাজে ঢাকা ও চট্টগ্রাম কাটায় বেশিরভাগ সময়। কলকাতা, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুরেও যায় প্রায়শই। অনেকেই তাকে নামে চেনে, দেখেছে কম লোকেই। বরং তার স্ত্রী শেফালী চৌধুরীর পরিচিতি ও খ্যাতি অনেক বেশি। তাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। দু'জনই পড়ে বিদেশে।

শেফালীর পিছুটান নেই। সার্বক্ষণিক সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে বক্তৃতা দেয়। স্থানীয় সংবাদপত্রে তার ছবি ও সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। যারা পত্র-পত্রিকা পড়ে, তারা তো বটে, যারা সে ধার ধারে না তারাও জেনে গেছে মুক্তিযুদ্ধে শেফালীর অবদানের কথা। সে একাত্তরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে, টাকা-পয়সা দিয়েও সাহায্য করেছে। এ খবর স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে বহুবার। ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী, বিখ্যাত সমাজসেবী হয়ে সে সবার সঙ্গে হেসে কথা বলে, মানুষের বিপদে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়ায়।

তার উদ্যোগে তালতলী বস্তিতে স্থাপিত হয়েছে একটি স্কুল। দিনে শিশুরা পড়ে, রাতে সেখানে মেয়েদের শেখানো হয় বুটিক ছাপ ও সেলাইয়ের কাজ। শেফালীর আরেক শখ বাসায় পার্টি দেয়া। বিভিন্ন উপলক্ষে বাড়িতে প্রায়ই ভোজসভার আয়োজন করা হয়। কোনোটায় রুবেল চৌধুরী থাকে, কোনোটায় থাকতে পারে না। কিন্তু এতে অনুষ্ঠানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় না। শেফালীই সামলে নেয় সবকিছু।

প্রতিবেশীরা বুঝতে পারে যে, বনফুল ভিলায় আজ কিছু একটা আছে। তারা শতাধিক হোমরা-চোমরার উপস্থিতি টের পায় রঙবেরঙের গাড়ির বহর দেখে। রাস্তায় কিছুটা যানজট দেখা দিয়েছে, কিন্তু শেফালী চৌধুরীর জন্য এতটুকু অসুবিধা মেনে নিতে কারও আপত্তি নেই।

এবারের পার্টির উদ্দেশ্যে বিলাত থেকে মেমবউ ও দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে তার

দেবর সোহেল চৌধুরী এসেছে। ফি বছরই একবার সপরিবারে আসে সোহেল। মেম বিয়ে করলেও তার রয়েছে দেশের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। নাড়ির যোগাযোগ। বউ ও দুই বাচ্চাকে বাংলা শিখিয়েছে। সোহেলের মেমবউয়ের মুখে বাংলা শুনে সবাই তাজ্জব বনে যায়।

এবার সোহেলের আসার উদ্দেশ্য কেবল বেড়িয়ে যাওয়া নয়। খুলনায় 'স্বাধীনতা মঞ্চ' থেকে ৭১ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সংবর্ধনা দেয়া হবে। তাদের একজন সোহেল। রয়েছে শেফালীও।

সোহেল মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার কারণেই শেফালীর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল। তা না হলে একাত্তর নিয়ে তার গর্ব করার কিছুই থাকত না, জুটত না এমন সংবর্ধনাও। তাই শেফালীর আছে দেবরের প্রতি এক ধরনের কৃতজ্ঞতাবোধও। রুবেল দেবর-ভাবীর সুসম্পর্ক দেখে ঠাট্টা করে বলে, রুবেল চৌধুরীর বউয়ের চেয়ে সোহেলের ভাবী হয়ে তুমি বেশি তৃপ্ত।

শহরের রাজনীতিক, সাংবাদিক, খ্যাতিমান মুক্তিযোদ্ধা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, আমলাদের নিয়ে নৈশভোজের আয়োজন। অনুষ্ঠানে দুই বিখ্যাত শিল্পী গান গাইবে। চমক আছে আরও। যা অভ্যাগতরা সময়মতো জানতে পারবে। রুবেলের মেমবউ বিলেতে বসেই রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছে– সেও গাইবে।

গল্পের ফাঁকে ফাঁকে উঠে এসে হেঁশেলে ঢুকছে শেফালী। খোঁজ-খবর নিচ্ছে রান্নাবান্নার। হঠাৎ কাজের বুয়া হাজেরার দিকে তাকিয়ে তার চোখ ছানাবড়া। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, কে তোমাকে মাংসে হাত লাগাতে বলেছে? তোমার হাতের খাবার কে খাবে, নিজের পরিচয় খেয়াল থাকে না?

কমলা বুয়া বলল, আম্মাজান অপরাধ আমার হইছে, আমি ভুল কইরা কইছি।

আসলে হাজেরার কাজ ঘরদুয়ার ঝাঁট দেয়া, ধোয়ামোছা। হেঁশেলে ঢোকা সম্পূর্ণ নিষেধ। এর কারণ অন্য বুয়াদের কাছে গোপন নেই। পতিতাপল্লীতে যৌবন কাটিয়ে ষাটোর্ধ্ব বয়সে শেফালীর দয়ায় তার কাজ জুটেছে এ বাড়িতে। বাণীশান্তা পতিতালয়ের হাজেরা বৈরাগী। কাজ দেয়ার সময় শেফালী তার নামের বৈরাগী বাদ দিয়ে বলল, এখন থেকে তুমি হাজেরা বিবি। হাজেরার ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ, তাই অন্য বুয়ারা তার পেছনের কথা প্রায়ই ভুলে যায়। কখনও কখনও তা মনে থাকে না শেফালী চৌধুরীরও।

কিন্তু তাই বলে সে মাংসের হাঁড়িতে হাত দেবে, তা কী করে মানা যায়! এবার রাগতস্বরে শেফালী বলল, বেরিয়ে যাও, আর এ মুখো হবে না।

অভিনব কাণ্ড ঘটিয়ে বসল হাজেরা। সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, আপনার ওই ভদ্দরনোক মেহমানের জনাপাঁচেককে আমি চিনি। একে একে নাম বলে ফেলল।

যখন আমার যৈবন ছিল, তখন আমার ঘরে যাইয়া ওরা আমারে কুইরা কুইরা খাইছে, আর আজ হাঁড়িত হাত দিলি সব নাপাক হইব! ক্যান, ক্যান?

এভাবে কথা বলা হাজেরার স্বভাববিরুদ্ধ। তাকে এমনভাবে রাগতে দেখেনি কেউ। শেফালী বলল, চুপ! আর একটি কথা বলবি না। কমলা বুয়া হাজেরার হাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে দিল।

এ ঘটনায় শেফালীর মাঝে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হলো, তা অতিথিদের চোখ এড়াল না। দুই-একজন বলল, ভাবী এনিথিং রং?

অনুষ্ঠানে দুই শিল্পীর সঙ্গে মেমবউও রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইল। তবে শেফালীর ইচ্ছে ছিল একটু গলা মেলাবে, তা আর হলো না।

হরেক রকম সুস্বাদু খাবারের খোশবু চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মেহমানরা শেফালীর রন্ধনবিদ্যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। শেফালী বারবার বলল, এ তেমন কিছু না, সামান্য আয়োজন।

মধ্যরাত পর্যন্ত আড্ডা গড়াল। তারপর সবাই একে একে বিদায় নিল। সোহেল ও মেমবউ তাদের সম্মানে এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় দারুণ খুশি। তারাও ফুরফুরে মেজাজে 'গুড নাইট' বলে শুতে গেল। ব্যাংকক থেকে রুবেল ফোন করে খবর নিল। অতি সংক্ষেপে কথা বলে ফোন রেখে দিল শেফালী। বলল, আমার বড্ড ঘুম আসছে সকালে তোমাকে ফোন দেব। কিন্তু শেফালীর চোখে ঘুম নেই। ঘরের মেঝেতে পাঁয়চারি করেই তার রাত কাটল।

শেফালীর দেরি করে নাস্তা খাওয়ার অভ্যাস। সকাল ১০টায় চায়ের টেবিলে বসে হাজেরাকে ডাকল।

পাথর মূর্তির মতো হাজেরা দাঁড়িয়ে। শেফালী বলল, কাল তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি।

না আম্মাজান, কী যে কন। আমিই অন্যায় কইরা ফ্যালাইছি। আর এই মাসটা আইলে আমার মাথা ঠিক থাহে না।

কোন মাস?

এই যে, স্বাধীনতার মাস!

কেন, এ মাসে কী হয়েছে তোমার?

এই মাসে যহন সবাই আমোদ-ফুর্তি করে, তহন আমার মাথায় খুন চাইপ্যা যায়। মনে অয়, ওই নিশানডারে ছিঁইড়্যা ফ্যালাই, সবকিছু ভাইঙ্গা-চুইরা নষ্ট করে দেই।

ছি! জাতীয় পতাকা নিয়ে এমন কথা বলো না। একাত্তরে কী হয়েছিল তোমার?

স্বাধীনতা অনেকরে গাড়ি-বাড়ি, কত কী দেছে, আর আমার সব কাইড়্যা নেছে। আমারে বেশ্যা বানাইছে।

কী বলো, পাকিস্তানি মিলিটারি কি তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল?

না, না ওরা ধরে নাই। দেশের মানুষই আমার সব কাইড়্যা লইছে।

শেফালীর কৌতূহল বেড়ে যায়। বলে-বলো তোমার সব কথা শুনব। এর মধ্যে সোহেল ও তার মেমবউ ঘরে ঢুকল। একই সময় হাজির হলো স্বাধীনতা মঞ্চের

আহ্বায়ক নবীন হাসান ও আরও কয়েকজন। ওদের অ্যাপয়েনমেন্ট দেয়া ছিল আগেই। নবীন মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার আফাজউদ্দিন সরকারের পুত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে ও তার বন্ধুরা মিলে গড়েছে 'স্বাধীনতা মঞ্চ'।

শেফালী বলল, এবার আমরা হাজেরার একাত্তরের কাহিনী শুনবো, পরে অন্য কাজ।

ঘরে পিনপতন নিস্তব্ধতা। কথক হাজেরা বিবি। সবাই আজ শ্রোতা। হাজেরা বিবির মুখ থেকে অনর্গল কথারাশি পাখনা মেলতে লাগল।

তয় শোনেন, আজ আমি মনের সিন্দুক খুইল্যা আমার দুইখ্যের কথা কই। আমার স্বামী খুলনায় আনসারে চাকরি কইরত। মজিবর যহন স্বাধীনতার ডাক দিল, তহন সেও ঝাঁপাইয়া পইড়ল। নড়াইলের মালিগ্রামে আমি শ্বশুর বাড়িতে থাইকতাম। আমাগো সুখের সংসার। আমি ছিলাম শ্বশুর-শাশুড়ির আদরের বউ, আমাগো দুই মাইয়া পারুল আর চম্পা দাদা-দাদি, চাচা-চাচির চোখের মণি।

যুদ্ধ শুরুর দিন দশেক পর একসাথে দুইখান চিঠি আইল। একখানে পারুলের বাপ লেখছে, আমি মুক্তিযুদ্ধে গ্যালাম, স্বাধীনতা লইয়া ঘরে ফিরব। আর যদি যুদ্ধে মারা যাই, তা হইলে দুঃখ কইরো না। দেশের মানুষ তোমাগো ভরণপোষণের দায়িত্ব লইবে। আর আব্বা ও আমার ছোট ভাইরা তো আছে। আব্বা-মারে সালাম, ভাইবোন, পাড়া-পড়শিদের শ্রেণীমতো সালাম ও দোয়া কইরতে বলিবা। আর আমার জানের টুকরা পারুল আর চম্পারে ভালোবাসা ও আদর দিও।

পাশের বাড়ির হারুন, কলেজে পইড়ত। তারে দিয়া যহন চিঠি পড়াইতেছিলাম, তহন ও ঠাট্টা কইর্যা কয়, ভাবী, ভাইজান তো আপনারে ভালোবাসার কথা কয় নাই।

আমি কইলাম, মশকরা কইরো না। তোমার ভাই বেলেহাজ নাকি যে, চিঠিতে ভালোবাসার কথা কইব?

যে দুইজন লোক চিঠি নিয়া আইছিল, তারা উঠানে জলচকিতে বসা। আমি লোক দুটির দিকে চাইয়া দেহি, তাগো চোখে পানি। আমার মাথায় চক্কর দিল।

হারুন দুই নম্বর চিঠি পইড়্যা কাইন্দা দিল, কমান্ডার সাব চিঠি দেছেন। লেখছেন, ভাবী সাব, আপনার স্বামী সুন্দরবনের কালিগ্রাম যুদ্ধে শহীদ হইছেন। জাতি তারে ভুইলবে না। আপনাদের সুখে-দুঃখে আমরা পাশে থাইকব। আমার মধ্যে কী আথালি-পাতালি শুরু হইল।

তারপর দেহি, সবাই আমার মাথায় পানি ঢালতেছে। কাইন্দা কাইন্দা কাটাইলাম কিছুদিন। সকলে সান্ত্বনা দিল। শ্যাষম্যাষ মাইয়া দুইডার মুখের দিকে চাইয়া শোক চাপা দিলাম। স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধারা আইল। কত কথা শোনাইল। কইল, বোন আপনার পাশে আমরা আছি। মজিবরের চিঠি পাইলাম, দুই হাজার টাকা দিছিল। শ্বশুরের হাতে দিলাম, ছেইল্যার শোকে শ্বশুর বিছানা লইল। কিছুদিন পরে বুইঝলাম,

আমি শ্বশুর-শাশুড়ির আদরের বউ আর নাই। মেজো বউ ছোট বউর আদর বাইড়ল, তাদের সুয়ামিরা তো কামাই করে। মরার বউ তহন ওগো মাথার বোঝা।

আমি দাঁত কামড়াইয়া পইড়্যা থাইকলাম। বছর না ঘুরতেই আমারে আলাদা কইরা দিল। কিন্তু জমি-ক্ষেতের ভাগ দিল না। ধলা হুজুর আইসা কইল, শরিয়া আইনে বাবা বাঁইচা থাকা অবস্থায় ছেইলা মইরলে তার সন্তানরা সম্পত্তির ভাগ পায় না।

জমি নাই, জিরাত নাই– আমার পারুল-চম্পারে কী খাওয়াইব? প্রথমে আমার ভাইরা কিছু কিছু দিত। সেইডাও বন্ধ হইয়া গ্যাল। আমি মানষের বাড়ি বাড়ি গতর খাটাই।

আল্লা আমারে গতরে রূপ দিয়া পাঠাইছিল, তাই কাল অইল। মরার বউ সবার ভাউজ অইল। ঠাট্টা-মশকরা মাইনা নিছিলাম, কিন্তু আমার ঘরের দরজায় টোকা দেয়া আরম্ভ হইল। সন্ধ্যা আইলেই বঁটি হাতে নিতাম। এতে কিছুডা কাজ হইল। কেউ আর হাত বাড়াইতে সাহস পাইল না।

তয় মফিজ চেয়ারম্যানের ভয়ে অস্থির হইয়া পইড়লাম। সে ছিল শান্তি কমিটির লোক। আমারে দেখলে শহীদ মুক্তিযোদ্ধার বউ কইয়া ঠাট্টা করে, তার কাচারি ঘরে আইতে কয়। জিগায়, স্বাধীনতা তোমারে কী দিছে? আমি তোমারে কষ্ট গুচাইয়া দিব, টাহা-পয়সা দিব। আমি কিছুই উত্তর-পশ্চিম করি না।

একদিন বৃষ্টির মধ্যে চেয়ারম্যানের বাড়ি থেইক্যা কাজ কইরা বাইর হইছি। আমারে দেইহা কইল, শুইন্যা যাও, একখান কথা আছে। কাচারি ঘরে আর কেউ নাই। ছেইল্যা-মাইয়া সব বাড়ির ভিতরে। রাইতে তারা বাইর অয় না। খালি চেয়ারম্যান কাচারিতে দরবার বসায়, আজ বিষ্টি দেইখা দরবার বসে নাই। চেয়ারম্যান একাই বইস্যা হুঁকা টানতেছে। কাজের লোক থাকে, দেখলাম তারাও নাই।

আমি কইলাম, কিসের কথা, এহন শুনব না। কিন্তু ব্যাটা বিষ্টির ভিতর নাইম্যা আমারে টাইনা ঘরে উঠাইল। মাইয়া দুইটার জন্যি থালে কয় মুইড্যা ভাত নিছিলাম, তা পইড়্যা গ্যাল। আমারে নিয়া ঝাপ্টাঝাপ্টি শুরু কইরল। আমি সুযোগ বুইজা তারে ধাক্কা দিয়া দৌড়ে পালাইলাম।

চেয়ারম্যানের বাড়িতে কাজ ছাইড়্যা দিলাম। এইছাড়া ইজ্জত বাঁচাইবার রাস্তা ছিল না। অন্য জায়গায়ও কাজ নাই। দেশে আকাল। মাইয়া দুইটার প্যাট নিলদাঁড়ায় লাইগা গ্যাছে। আমিও পড়ি কি মরি। আর থাকবো কোথা? ঘরের চাল দিয়া বিষ্টি পড়ে। বিষ্টি আইলে মাইয়া দুইডা লইয়া ভিইজ্যা চুবুচুবু হইয়া যাই। আমার তো সহায়-সম্পত্তি নাই। যাগো কিছু ছিল, আকাল তাগো ঘরেও ঢুকল। সবাইর অবস্থা বেগতিক। তখন দেহি গ্রামের বউঝিরা বাঁচার আশায় শহরে যাইতেছে।

আমি চোখ বুঁইজা পারুল আর চম্পারে লইয়া দলের সাথে নিরুদ্দেশে বাইর অইলাম। ফরিদপুর শহরে গ্যালাম। শহর কী আগে দেহি নাই। এহানে আমার এক

সম্পর্কে খালাতো ভাই থাইকত, আগে তার খোঁজ লইলাম। তারে পাইলাম না। কত গুরাগুরির পর এক মৌলবী গোছের লোকের বাড়িতে কাজ পাইলাম। সে আমার দুঃখের কথা শুইনা তার বাড়িতে মাইয়া দুইডারে লইয়া থাহার জায়গাও দিল। তার বউ ছিল না। পোলারা বাইরে চাকরি-বাকরি কইরত। আমি রান্নাবান্না কইরা দিতাম। বাড়ির সগল কাজই কইরতাম। তার কুদৃষ্টি পইড়ল। কইলাম, আপনি বাপের বয়সী। আমি আপনারে সেই চোখে দেহি। কেডা শোনে? এ্যাদ্দিন নিজেরে আগলায়া রাইখছিলাম, যে ইজ্জত নিয়া বড়াই কইরছিলাম। তা অ্যাক নিমেষেই খোয়াইলাম। সেদিন আমার ওপর কিয়ামতের গজব নাইমল। তা মনে কইরলে আমি বেহুঁশ হইয়া যাই। জান বাইর কইরা দেওয়ার কথা চিন্তা কইরছিলাম। কিন্তু মাইয়া দুইডার কথা বাইবা কিছুই কইরলাম না। পাথর হইয়া গ্যালাম, আল্লারে কইলাম, তুমি ক্যান চক্ষু বুঁইজা আছো, তোমার কি কিছু করার নাই?

হাজেরা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগল শুধু।

সেই কাজ ছাইড়্যা আবার পথে নামলাম। এইখানে-সেইখানে ঘুইরা এ্যাক বুড়ির ঘরে জায়গা অইল। একদিন পাশের ঘরে মতি মিয়া আমারে কাজ দেয়ার লোভ দিয়া রথখোলা বেশ্যাপাড়ার এক সর্দারণীর হাতে তুইল্যা দিল। সর্দারণী কইল, তোমারে মাইয়ার মতো জানি, তুমি রান্নাবান্না কইরবা। তোমারে দিয়া ব্যবসা করাইব না। কিন্তু ওই কি অয়? একদিন গুন্ডারা আইসা আমার ওপর আছর হইল। সেইডা সে সর্দ্দারণীর কৌশল ছিল। তা পরে বুইজাছি। সেই ঘটনার কয়েকদিনের মাথায় বেশ্যার খাতায় নাম লেখাইলাম। আপনারা আমারে গালি দ্যান, আমার মুহে থু থু জাড়েন, কিন্তু আমার উপায় ছিল না, কোনো উপায় ছিল না।

এভাবেই সে বয়ান করে চলল ফরিদপুর থেকে গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ থেকে খুলনা বাণীশান্তা পতিতালয়ের অভিশপ্ত জীবনের মর্মস্পর্শী কাহিনী। মায়ের মতো পতিতাবৃত্তিতে নামতে বাধ্য হয় পারুলও। কেবল বুদ্ধি খাটিয়ে একজন মুদির দোকানদারের তত্ত্বাবধানে চম্পাকে এই জগৎ থেকে দূরে রেখেছে। এসএসসি পর্যন্ত পড়িয়ে বিয়ে দিয়েছে এক ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে। সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয় চম্পার স্বামী মোবারক। সে এখন পঙ্গু। তাই চম্পার সংসারের খরচ দিতে হয় হাজেরা ও পারুলকে। তবু তারা খুশি। চম্পা গেরস্ত ঘরের বউ। তার একটি ছেলে আছে। হাজেরা বলল, এই নাতিটাই এহন ওয়াজেদ বেপারীর বংশের বাত্তি। পারুলের ইচ্ছা আর কিছু টাকা জমলে এ ব্যবসা ছেড়ে দেবে। তারপর চম্পার ছেলেকে নিয়ে এক স্বাধীনতা দিবসে সবাই মিলে দেশের বাড়িতে হাজির হবে। জানান দেবে, আমরা শহীদের সন্তান। তাদের বাবার রক্তে এসেছে স্বাধীনতা। এমন স্বপ্ন বুকে নিয়ে পারুল এখনও মিটিয়ে চলেছে হরেকরকম খদ্দেরের বায়না।

হাজেরা বিবি বুক চাপড়িয়ে বলল- সেই সুযোগ কি কোনোদিন আইব? আমার নাতি কি কইতে পাইরব, তার নানা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হইছে? তাই তো কই স্বাধীনতার

মাস আইলে আমি পাগল হইয়া যাই। যাগো স্বাধীনতার লাইগ্যা চার পয়সার ক্ষতি অয় নাই, স্বাধীনতা তাগো লাইগ্যা, আমাগো লাইগ্যা না।

কারও মুখে কথা নেই। নবীন উঠে এসে হাজেরার পা স্পর্শ করল, তার দেখাদেখি স্বাধীনতা মঞ্চের সদস্যরা সবাই হাজেরা বিবির পদধূলি নিল। হাজেরার এক হাত ধরল শেফালী, আরেক হাত ধরল সোহেল। তাকে সোফায় বসাল। মেমবউ মুছে দিল তার চোখের জল। মনে হলো, নির্যাতিত নারীর করুণ উপাখ্যান ওদেরকে জাগিয়ে দিয়েছে। সবার বুকে তখন একাত্তরের স্পন্দন।

হাজেরা বলল, আপনারা আমার নাপাক শরীর ছুঁইয়েন না। পাপ অইব। নবীন বলল, মা! আপনি শহীদ বীরজায়া। যারা আপনাকে যোগ্য সম্মান না দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়েছে, নিপীড়ন করেছে, তারাই পাপিষ্ঠ।

সোহেল বলল, এই পাপের ভাগীদার আমরাও। আমরা শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিজনের দায়িত্ব নিতে পারিনি। এই ব্যর্থতার গ্লানি আমরা কেউ এড়াতে পারি না।

নবীন বলল, এবার সংবর্ধিতদের তালিকায় সবার ওপর থাকবে আমাদের জননী, শহীদজায়া হাজেরা বিবি।

সোহেল ও শেফালী এক সঙ্গে বলে উঠল, অন্য কাউকে নয়, এবার 'স্বাধীনতা মঞ্চ' থেকে কেবল আমাদের বোন হাজেরা বিবিকেই সংবর্ধনা দাও।

হাজেরা বিবি বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, না, আমি কিচ্ছু চাই না। আপনারা আজ আমারে একদিনের লাইগ্যা হইলেও পাশে বসাইছেন। ভদ্দর লোকের এই পোলাগুলা আমারে মা কইছে। এতকাল নিজেরে ছিনাল-মাগী বলেই জাইনা আসতেছি, আজ আমি আপনাগো বোন হইছি, পোলাগুলার মা হইছি। এইটাই আমার বড় পাওয়া, না আমি আর কিচ্ছু চাই না, কিচ্ছু চাই না।

একজন কয়েদির আত্মহত্যা

শীতের বিষণ্ন সকাল। কুয়াশার আড়ালে নিস্তেজ সূর্যকিরণ। জানালার ফাঁক গলে ঘরে ঢুকছে মাঘের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। বিজুর গায়ে মেরুন রঙের শাল। সকালে খাটে বসে পত্রিকা হাতে চা খাওয়া দীর্ঘদিনের অভ্যাস। সাতসকালে হাসপাতালের ডিউটিতে যাওয়ার আগে বিজুকে ঘুম থেকে ডেকে এক কাপ চা দিয়ে যায় রুবিনা। সাদা অ্যাপ্রোন পরে দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়া মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে বিজু। এ কি কোনো বৈধব্যের বেশ নাকি স্বর্গ থেকে নেমে আসা দেবী, ঠিক মেলাতে পারে না। শীত, গ্রীষ্ম– বারো মাসই প্রতিদিন বিজুর বিছানার পাশে মা এসে হাজির হয় এক কাপ চা নিয়ে। এমনকি যেদিন রাতে ডিউটি থাকে সেদিনও। সারারাত রোগীদের দেখাশোনা করে ঘরে ফিরেই চুলা জ্বালিয়ে চা বানায়, অতি আদরে মেয়ের সামনে কাপটা ধরে ডাকে, বিজু বিজু।

বাবাকে দেখেনি বিজু, যখন সে মায়ের পেটে, তখন বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন।

মা-মেয়ের সংসার। মতের অমিল বলতে কিছু নেই। বিজু এমনিতে মায়ের একান্ত বাধ্য। কিন্তু ইদানীং একটি ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে বিজুর। শান্ত বিজু এখন একরোখা জেদি। যেন এক অচেনা মেয়ে! মা রুবিনা মেয়ের জেদের কাছে পরাস্ত হয়ে চুপসে গেছে। রুবিনার কথা, চাকরি-বাকরি, গবেষণা যা করতে চাস করিস, আগে বিয়েটা কর। এই বয়সে বিয়ে করবি না, তা কী করে হয়? বিজু অনড়। গবেষণা করবে। বলেছে, বাবাকে দেখিনি। মুক্তিযুদ্ধের গবেষণার মাঝেই আমি বাবার স্মৃতি খুঁজব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী বিজু । রেজাল্ট ভালো, বহু প্রতিকূলতার মধ্যে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। এখন মুক্তিযুদ্ধে কৃষকের ভূমিকা নিয়ে পিএইচডি করছে। এ নিয়েই তার সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা। গবেষণার নেশায় পেয়ে বসেছে তাকে। রুবিনা তার দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পারে, বাপকে না দেখলেও বাপের রক্ত ও চেতনা দুটোই সমান পেয়েছে বিজু। লাইব্রেরিতে পড়ে থাকছে দিনভর, দলিলপত্র ঘাঁটছে। বাসায় এসে সারারাত বই পড়ছে, কখনও লিখছে, কখনও অস্থির পায়চারি করছে। আবার প্রায়ই ছুটছে এখানে-সেখানে, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন স্থানে। কিন্তু কোনো ক্লান্তি নেই চোখে-মুখে।

গেল সপ্তাহে যশোর থেকে ফিরে বিজু যেন খানিকটা অস্থির। সকালে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বিজুর ঘরে গিয়ে রুবিনা দেখেছে বিজু বিছানায় বসে আছে। মুখটা থমথমে। রুবিনাকে দেখে বলল, মফিজ চাচার জন্য কিছু করতেই হবে। কথা শুনে মেয়ের মনের ভাব আঁচ করতে পারে রুবিনা। আর মনে মনে খুশিও হয়। বুঝতে পারে, বাবার পথেই চলেছে মেয়ে। এ পথ গর্বের, আবার ভয়েরও। এক অজানা ভয়ে আঁতকে ওঠে রুবিনা।

মফিজ বিজুর বাবার বন্ধু ও একাত্তরের সহযোদ্ধা। শৈশবে বিজু তাকে দেখেছে, কিন্তু এতদিন পর চেহারাটি স্মৃতিতে ছিল না। যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি। তার সাক্ষাৎকার নিতেই সেখানে গিয়েছিল বিজু।

যেদিন বিজু শুনেছিল কমান্ডার মফিজ ডাকাতি মামলায় জেলে গেছে, সবচেয়ে বড় কষ্ট পেয়েছিল সেদিন। ওর মা চেঁচিয়ে বলেছিল, আমি বিশ্বাস করি না। এটা নিশ্চয়ই রাজ্জাক চেয়ারম্যানের ষড়যন্ত্র। রুবিনা এ বিশ্বাসে অটুট। বিজু একদিন মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিল, মা আমি সারাক্ষণ মনে রাখি, আমি শহীদ মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে। আমার রক্তে মিশে আছে মুক্তিযুদ্ধ। তারপরও মনে করি না যে, মুক্তিযোদ্ধারা বিপথগামী হতে পারে না। মুক্তিযোদ্ধারা কেউ কেউ অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে, লোভে রাজাকারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে– এমন ঢের উদাহরণ আমার জানা আছে।

রুবিনা বলল, অন্য যে যা-ই করুক, মফিজ কমান্ডার অন্যায় করতে পারে না, ভুল পথে যেতে পারে না। শোন, যে দুইটা লোকের জন্য স্বাধীনতার পর তিনটা বছর স্বামীর ভিটায় থাকার সাহস পেয়েছিলাম, তার একজন তোর বড় চাচা আর একজন এই মফিজ কমান্ডার। ফেরেশতার মতো মানুষ, তবে বদমেজাজি। '৭৭-এর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সময় তিনি রাজ্জাক মিয়াকে বলেছিলেন, আপনি কেন আবার চেয়ারম্যান ইলেকশনে খাড়াইলেন, আপনি তো শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আছেনই।

যশোরে যাওয়ার আগে রুবিনা বলেছিল, তুই কি তোর মফিজ চাচার কাছে গিয়ে পরিচয় দিবি না? বিজু জবাব দিয়েছিল, না, গবেষকের কোনো আবেগ থাকতে নেই। সত্যকে নির্মোহভাবে তুলে আনা তার কাজ।

যশোরে গিয়ে বিজু ডেপুটি জেলার সমীর ভৌমিকের সরকারি কোয়ার্টারে উঠেছিল। সমীর ভৌমিক তার বান্ধবী রত্নার বাবা। ঢাকায় যখন তার পোস্টিং ছিল, তখন সে রত্নার সঙ্গে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারও ঘুরে দেখেছে। রত্না ফোন করে তার বাবাকে বিজুর যাওয়ার কথা জানিয়েছিল। সমীর ভৌমিক বিজুকে পরদিন ফোন করে বলেছিল, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তবে অন্য কোথাও নয়, ডাইরেক্ট আমার বাসায় চলে এসো। না বলতে পারেনি বিজু।

মানুষের সঙ্গে মানুষের এই বন্ধন বিজুকে বিমোহিত করে। তার মেনে নিতে কষ্ট হয়, মানুষ কী করে সামান্য স্বার্থে একে অপরের প্রতি নির্দয় হয়ে ওঠে। সে একাত্তরের ইতিহাসে ফিরে যায়। বুঝতে পারে, তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধন ছিল আরও

নিবিড়। গোটা জনগোষ্ঠীই হয়েছিল যেন একটি পরিবার। তবে মুষ্টিমেয় দালাল-রাজাকার ছাড়া– সংখ্যায় যারা ছিল খুবই কম।

কারাগারের গেটের একটি নির্জন কক্ষে বিজু অপেক্ষা করছিল। শুভ্র চুল-দাড়ি, বয়স ষাটের কোঠায়। সাদা-কালো ডোরাকাটা কয়েদির পোশাক পরা ভগ্নস্বাস্থ্যের এক লোক এসেই সালাম দিল। বিজু ইচ্ছা থাকার পরও আগে 'সালামালাইকুম' বলার সুযোগ পেল না। একটি চেয়ার ও একটি টুল পাশাপাশি রাখা। বিজু চেয়ার দেখিয়ে বলল, বসুন। মফিজ চেয়ারে না বসে টুলে বসল। বলল, ডাকাতি মামলায় সাজা পাওয়া কয়েদির তো চেয়ারে বসার অধিকার নেই।

– আচ্ছা মা, আপনি কে, কেন আমারে ডাকছেন?

– আমি একজন গবেষক, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করছি।

– বই লিখবেন, মুক্তিযুদ্ধের বই? আমার মুক্তিযুদ্ধ তো হারায়ে গেছে। খুনি ডাকাতের মুখে মুক্তিযুদ্ধের কথা কী শুনবেন?

– আজ আপনি জেলে আছেন সত্য, কিন্তু একাত্তরে আপনি অস্ত্র হাতে লড়েছেন, সেটি তো মিথ্যা নয়। সেই কথাই বলুন।

বলেই টেপ রেকর্ডারটা অন করলো বিজু।

– হুম, তাহলে শোনেন। আমি লেখাপড়া বেশি জানতাম না। এইট পর্যন্ত পড়েছিলাম। খেলাধুলা, নৌকাবাইচ, ঘোড়দৌড় সবকিছুরই আগে থাকতাম। শখের বসে আনসার ট্রেনিং নিয়া অস্ত্র চালানো শিখছিলাম। গ্রামের সমবয়সীদের মধ্যে বেশ মিল-মহব্বত ছিল। আমাদের জানিশত্রু ছিল রাজ্জাক চেয়ারম্যান ও তার চেলারা। '৬৯ সালে আইয়ুব খানের পতনের পর তাগো দাপট কমল না। তারা '৭০-এর নির্বাচনে পিডিপির ক্যান্ডিডেটের জন্য উঠেপড়ে লাগল। আমরা সবাই নৌকার সাপোর্টার। ভোটে নৌকা জিতল, কিন্তু ইয়াহিয়া ক্ষমতা দিল না। ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করল, ঢাকায় হামলা চালাল। তখন আমরা যুবকরা সবাই মিলে আমার বন্ধু রহমান মাস্টারের বাড়িতে বসলাম। কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলাম না।

বাবার নাম শুনে বিজুর চোখ ভিজে উঠল। অশ্রু সংবরণ করে বলল, আপনি বলে যান।

– নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা হতে লাগল। সন্ধ্যায় বিবিসির খবর শোনার পর সলাপরামর্শ চলত। একদিন আমরা মনস্থ করলাম, আর বসে থাকা যায় না। কিছু একটা করতে হবে। বঙ্গবন্ধু তো ৭ই মার্চ বলেই দিছেন– যার যা কিছু আছে, তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।

আমরা প্রথমে ৬ যুবক বাংলার মাটি ছুঁয়ে শপথ নিলাম। বললাম, বাংলার মাটি অপবিত্র হইতে দেব না, জানোয়ারদের নির্মূল করব। তারপর ব্রিজে টহল দেওয়া আনসারদের কাছ থেকে বুদ্ধি খাটাইয়া ৪টা রাইফেল পাইলাম। তখন আমাদের আনন্দ দেখে কে? রহমান কইল, তুমি ট্রেনিং জান, তুমিই আমাদের কমান্ডার। সবাই

সমর্থন জানাইল। তারপর রাজাকারদের ওপর আক্রমণ কইরা, থানায় হামলা চালাইয়া অস্ত্র বাড়াইয়া ফেলাইলাম। তিন মাসে অস্ত্র দাঁড়াইল ২০টা, দলে হইল ৫০ জন। তবে একসঙ্গে ১০-১২ জনের বেশি এক জায়গায় হইতাম না। আশপাশে আরও দুই-তিনটা মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন হইল। রহমান তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে লিখিত 'নীতিমালা' বানাইল।

– কী নীতিমালা?

– এক নম্বর কথা ছিল, আমরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা, আমাদের লক্ষ্য স্বাধীনতা। আমরা কেউ কাউরে আক্রমণ করব না। সবাই মিলে পাকিস্তানি হানাদারদের হটাব। কখনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে সবাই বসে মিটাইয়া ফেলব।

– কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা কি ঘটেছিল?

– হ্যাঁ, রামনগরে দুইটা মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হইয়া গেল। একজন মারাও গেল। সেই ঘটনায় রহমান ছুইটা যায়। বহু দেন-দরবারের পর দুই পক্ষ শান্ত হয়। সবাই মিলে মৃত ব্যক্তির পরিবারের কাছে গিয়া ক্ষমা চায়। তারাও ক্ষমা করে দেয়। সেদিন একটি দলিল করা হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, মৃত রজ্জব আলীর সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব মুক্তিযোদ্ধাদের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সবাই সরকারকে রজ্জব আলীর পরিবারের দায়িত্ব নিতে বলবে। প্রতিপক্ষ গ্রুপ ১০ হাজার টাকা দিয়া সাহায্য করেছিল।

– স্বাধীতার পর সরকার কি সেই দায়িত্ব নিয়েছিল?

– সেই দুঃখের কথা কারে কইব? শুধু রজ্জব আলীই না, কারও খোঁজখবরই সরকার নিল না। গড়াই নদী দিয়া পাকবাহিনী আইস্যা আমাদের বাজার আক্রমণ করবে– সেই খবর পাইয়া আমরা ১১ গ্রুপের কমান্ডার ও সংগঠক মিলে মিটিং করলাম। একযোগে মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রতিরোধ করলাম। সেই যুদ্ধে আমার বন্ধু রহমান ও আরও দুইজন শহীদ হইল। সেই শহীদদের খোঁজ কি কেউ রাখছে?

মফিজের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। বিজু অশ্রু সংবরণ করতে পারল না। বিজু বলল, যুদ্ধে কি পাকসেনারা জয়ী হলো?

– না, না আমরাই জিতলাম। আমরা শহীদ তিনজনকে বাজারের পাশে কবর দিলাম। হাজার হাজার মানুষ হইছিল তাদের জানাজায়। একদিকে বন্ধু হারানোর শোক, আরেকদিকে বিজয়ের গৌরব, আনন্দ। রহমানের জন্য কি কিছু করতে পারছি? কিছুই পারি নাই। তার বউ-সন্তানকেও আগলাইয়া রাখতে পারি নাই। কবরটা অবহেলায় পইড়া আছে।

বিজুর স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে, সে মায়ের কোলে বসে প্রথম বাবার কবর দেখতে গিয়েছিল। মা বলেছিল, ওখানে মাটির নিচে তোর বাবা ঘুমিয়ে আছে। 'বাবা বাবা ওঠো, বাড়ি চলো, আমি তোমাকে দেখব...' এমনই কত কথাই না সেদিন

সে বলেছিল। কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারপরও বারদুয়েক বাবার কবরে গিয়ে চোখের জল ফেলেছে। তবে গত ১০ বছর তার বাড়িতে যাওয়া হয় না। রুবিনা বলে, বাড়িতে গেলে ৭ দিন লাগবে। তোর পড়াশোনার কত ক্ষতি হবে। কিন্তু আসল কারণটা হাতটান। একসঙ্গে যাতায়াতের রাহা খরচ জোগাড় করা হয়ে ওঠে না। আর তা ছাড়া কোথায় গিয়ে উঠবে? বিজুর চাচা বেঁচে নেই। মফিজ কমান্ডার জেলে। কে তাদের আশ্রয় দেবে? আরেকটা বড় কারণ আছে, সেটিও বিজুর অজানা নয়। তার মায়ের প্রতি রাজ্জাক চেয়ারম্যানের কুদৃষ্টি। এ ঘটনাটিই মা'র গ্রামছাড়া হওয়ার বড় কারণ।

বিজু দেখে, মফিজ নীরবে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বিজু ছকবদ্ধ প্রশ্ন করতে পারছে না। এখন সে আবেগতাড়িত। সে বুঝতে চাইছে, বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধারা কেন পরাজিত হলো, কেন মুক্তিযোদ্ধাদের অবমহ্যল্যায়ন করা হলো? কেন মফিজ আজ ডাকাতি মামলার আসামি?

– একাত্তরে আপনারা জয়ী হলেন, কিন্তু সেই জয় কেন ধরে রাখতে পারলেন না?

– সেই প্রশ্ন আমারও। দেশ স্বাধীন হইল, আমাগো মনে ফুর্তি ধরে না। আমরা অস্ত্র জমা দিলাম। এবার ভাবলাম, দেশ গড়ার কাজ করব। কিন্তু আমাগো কাজে লাগানো হইল না। একদিন, জমির উদ্দিন, সে ছিল দিনমজুর। আইস্যা কইল, কমান্ডার ভাই, কীভাবে সংসার চলবে? আগে তো চেয়ারম্যানের বাড়িতে কাজ করতাম। এখন মুক্তিযোদ্ধা হইয়া কি রাজাকারের কাছে গিয়ে ধরনা দেব? আমি সদুত্তর দিতে পারি নাই।

– কী করল জমির উদ্দিন।

– একদিন কাউরে না জানাইয়া বৌ-বাচ্চা লইয়া রাজশাহী চইল্যা গেল। সেখানে রিকশা চালাইয়া খায়। সে আপস করে নাই। আমার দলের দুইজন মুক্তিযোদ্ধা শান্তি কমিটির মেম্বর আখতার আলীর আড়তে চাকরি লইছে। এখন ওই রাজাকারের বাচ্চা কয়, আমিই শান্তি কমিটিতে থাইক্যা এলাকায় পাকবাহিনীরে আসতে দেই নাই। আর মুক্তিযোদ্ধাদের চালাইছি। তার এই কথায় সায় দেয় ওই দুই মুক্তিযোদ্ধা।

নীরব শ্রোতা পেয়ে গলগল করে মনের কথা উজাড় করে দেয় মফিজ। বলতে বলতে ফুকুর ফুকুর করে কাশতে শুরু করে। উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। গামছা দিয়ে মুখ চেপে ধরে। বন্ধ হয় না কাশি। একজন কয়েদি পানি এনে দেয়। একটি ট্যাবলেট খেয়ে একটু শান্ত হয় মফিজ।

বিজু ডেপুটি জেলারের কাছে শুনেছে, হাঁপানি, পিত্তশূলসহ নানা কঠিন পেটের রোগে আক্রান্ত মফিজ। মেডিকেল গ্রাউন্ডে সাজা মওকুফের জন্য দরখাস্ত দেওয়া হয়েছিল। মওকুফও হয়েছে দুই বছর, তবে আরও ৬ মাস থাকতে হবে।

ডেপুটি জেলার এসে তাদের খোঁজখবর নিয়ে যায়। চা-বিস্কুট আসে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কথা শুরু করে মফিজ।

– বহুদিন মন খুইল্যা কথা কই নাই। আর কাউরে বলার সুযোগ হইবে কি না জানি না। আপনারে কইয়া যাই। কী জানি শুনতে চাইছিলেন?

– মুক্তিযোদ্ধারা কী করে পরাজিত হতে লাগল?

– সেই কারণ বাইরে থাইক্যা বুঝি নাই। তবে জেলে আইস্যা খানিকটা পরিষ্কার হইছে। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় আসল। কিন্তু বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের পরাজয়ের পালা শুরু হইল। তাদের দেশ গড়ার কাজে লাগানো হইল না। যে পুলিশরা পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করছিল, আমাগো ধরাইয়া দিছিল, স্বাধীন বাংলায় তাদের চাকরি রইয়া গেল। তাদের খাতিরের লোক ছিল শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান-মেম্বাররাও। তাই স্বাধীনতার অল্পদিন পরই তাগো দাপট আগের মতো বাইড়া গেল। আর কিছু শিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা শান্তি কমিটির মেম্বার-চেয়ারম্যানদের মাইয়া, ভাস্তি-ভাগনি বিয়া কইরা একাত্তর ভুইলা গেল। ভুলতে পারলাম না আমরা, কৃষকের পোলাপান। যেসব নেতা শহর থেকে আইস্যা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল, তারা শহরে যাইয়া চেহারা ভালো বানাইয়া ফেলল। আমাগো চেহারা খারাপ হইতে থাকল। কাজ পাইলাম না, সম্মান পাইলাম না। বরইতলার কদ্দুস ডাকাত মুক্তিযুদ্ধে গেছিল, সে পরে আবার ডাকাতিতে ফির‍্যা গেল। একবার ধরা পড়ার পর তাকে জজ সাহেব কইলেন, মুক্তিযোদ্ধা হইয়া কেন আবার খারাপ পথে আইছ? সে জজ সায়েবকে ঠাট্টা করে কইল, অস্ত্র জমা দেওয়ার সময় কইছিলাম, একটা কাজ দ্যান। বলা হইল, যার যার পেশায় ফির‍্যা যাও, তাই আমি আমার পুরান পেশায় ফির‍্যা আইছি।

বিজু মৃদু হেসে গল্পের গূঢ় অর্থ বুঝে চুপ হয়ে গেল। সে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল। একজন স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তি স্বাধীনতা-উত্তর পরিস্থিতির যে বিশ্লেষণ করলেন, তা কোনো বিজ্ঞ অধ্যাপক বা গবেষকের কাছে শোনেনি সে। বিজু টেপরেকর্ডারে নতুন ক্যাসেট ঢুকাল।

– আপনি বলে যান। আমি শুনছি।

– আসলে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কোনো সরকারের ভাবনা ছিল না। মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের নামে গরু-ছাগলের হাটের তোলা উঠানোর কাজ দেওয়া হইল। এই কাজ করতে যাইয়া মুক্তিযোদ্ধারা হইল মানুষের চোখের কাঁটা।

– আপনি কেন জেল খাটছেন?

– আপনি কি বিশ্বাস করবেন? তবে আমার এলাকার মানুষ জানে, তারা মফিজ কমান্ডারকে চিনে।

– বলুন।

–আশি সালের ঘটনা। বিলের খাসজমি জেলেদের না দিয়া সমিতির নামে সরকারি দলের চেলাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হইল। ওই সমিতিতে রাজাকার আর মুক্তিযোদ্ধা দুই-ই ছিল। তখন রাজাকার-মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দোস্তি হইয়া গেছে। জেলেরা ছিল হিন্দু। আমরা হিন্দু-মুসলমান আলাদা চোখে দেখার জন্য তো দেশ

স্বাধীন করি নাই। আমি জেলেদের হইয়া ঘোষণা দিলাম, ওদের দখল দিব না। তখন মুখোমুখি কাইজ্যায় ওই দলের এক লোক মার্ডার হয়, সেই মার্ডার কেইসের হুকুমের আসামি, ডাকাতি, লুটপাট ইত্যাদি ধারায় গ্রেফতার হই। আমার দুইজন মুক্তিযোদ্ধা ভাইও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়। জীবনভর শুনছি, কাকের মাংস কাকে খায় না কিন্তু মুক্তিযোদ্ধার মাংস মুক্তিযোদ্ধারা খাইল। মুক্তিযোদ্ধারা এক থাকলে কি কোনো দিন রাজাকারদের এতো দাপট বাড়ত?

বিজু তার বাবার প্রসঙ্গ তোলার কথা ভাবছিল। কিন্তু কীভাবে আনবে বুঝতে পারছিল না। শুধু বলল, শহীদ আবদুর রহমানের...

– আমার দোস্ত রহমানের বিধবা বউ, শিক্ষিত মেয়ে, ম্যাট্রিক পাস। বিয়ের ৫-৬ বছরে কোনো সন্তান হয় নাই। একাত্তরে গর্ভবতী। যুদ্ধে যাওয়ার সময় রহমান তার বউরে কইছিল, আমি যুদ্ধে যাইতেছি। জানি না, জীবিত না মৃত ফিরে আসব। তবে পুত্রসন্তান হইলে নাম রাখবা বিজয়, আর মেয়ে হইলে বিজয়া। তার বউ জিজ্ঞেস করছিল, তুমি না থাকলে তোমার সন্তানরে কে দেখবে? রহমান জবাব দিছিল, আমি যাদের জন্য যুদ্ধ করছি, সেই দেশের মানুষ দেখবে, স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার দেখবে।

– তারপর কী হলো?

– ভাবীজান ৩-৪ বছর স্বামীর ভিটা কামড়ে ছিল। রহমানের বড় ভাই ভালো মানুষ। তার মৃত্যুর পর রহমানের বউ অভিভাবক ছাড়া হইয়া গেল। আমি তারে আর আগলাইয়া রাখার ভরসা পাইলাম না। আমার অবস্থা খারাপ। তার ওপর রাজ্জাক মিয়া নতুন করে চেয়ারম্যান হইল। রহমানের বউয়ের উপর চেয়ারম্যানের কুদৃষ্টি ছিল। সেটাই ভাবীজানরে ভাবাইয়া তুলল। উনি তার এক খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ কইরা ঢাকা গিয়ে নার্সের চাকরি পাইল। আমি একবার পেটের ব্যথা নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়া তার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। আমারে ভর্তি করাইয়া দিছিল। কী দরদি মানুষ! বাসায় থেকে রান্না কইরা খাবার আইন্যা খাওয়াইত। আমি রহমানের বউ-বাচ্চার জন্য কিছুই করতে পারি নাই। বছর চারেক জমির ফসলের টাকাটা তারে পৌঁছাইয়া দিছি। তারপর একবার কইল, ভাইজানের ছেলেমেয়েরা কষ্টে আছে। জমি-জিরাত আপাতত আমার দরকার নাই। এখন চাকরির টাকায় চলতে পারতেছি। না পারলে তখন বলব। এত বড় মনের মানুষ দুনিয়ায় ক'জন আছে?

রহমানের বউ যা করেছে, আমরা তা পারি নাই। মেয়েটারে মানুষ করেছে। মেয়েটার নাম বিজয়া রহমান। সবাই বিজু বলে ডাকে। আপনার বয়সী হইবে।

একটি আশঙ্কা বিজুকে তাড়া করে ফিরছে। ডেপুটি জেলার সমীর বলেছিলেন, সে কষ্ট সইতে না পেরে দুই-তিনবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। তাই তাকে এখন

সেলে রাখা হয়। সেলে কোনো জিনিসপত্র রাখতে দেওয়া হয় না, যা দিয়ে সে আত্মহনন করতে পারে।

বিজুর পত্রিকা পড়ায় মন নেই। সে ভাবছে, কী করে মফিজ চাচাকে মুক্ত করে আনবে। তার বন্ধু প্রদীপ এখন সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী। ব্যারিস্টার রাহাত চৌধুরীর জুনিয়র। রাতে ফোন করেছিল, পায়নি। তার কাছে আজই যাবে।

অন্যমনস্কভাবে পত্রিকায় চোখ বুলাতে বুলাতে হঠাৎ 'একজন কয়েদির আত্মহত্যা' শিরোনামের একটি ছোট বক্স খবরে তার চোখ আটকে গেল, এক নিমিষে পড়ে ফেলল।

বিজুর হাতের পত্রিকাটি পড়ে যায় গায়ের শাল ছুড়ে ফেলে সে। কুয়াশাঢাকা শীতের সকালে সে ঘামছে। বাবার মৃত্যুতে তার কান্নার সৌভাগ্য হয়নি। সে হাউমাউ করে কাঁদছে।

হঠাৎ কান্নার দমকে কেঁপে ওঠে রুবিনার হাতের চায়ের কাপ আর প্রতিবেশীদের অন্তরাত্মা।

পোতার মাটি

পেট্রাপোল সীমান্ত চৌকি থেকে কয়েক পা দূরে মানি একচেঞ্জ ঘরের সারি। এরই একটি ঘরের বেঞ্চিতে বসে আমি সাতচল্লিশের দেশবিভাগের পটভূমিতে বিচরণ করছি আর ভাবছি, দু'পারের বৃক্ষলতার রঙ, বাতাসের পরশ, মাটির গন্ধ সবই এক। আমরা অভিন্ন ভাষায় কথা বলি। তারপরও একে অপরের কাছে পরদেশি...।

চিন্তার ছেদ ঘটালেন এক বৃদ্ধ। ধুতি পরা একটু বেঁকে যাওয়া চেহারার লোকটি হাঁফাতে হাঁফাতে আমার পাশে এসে বসলেন। কোনো দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি এসে ধুতির গিঁট খুলে কি যেন পরখ করলেন, গন্ধ শুঁকলেন, তারপর তা দ্রুত বেঁধে ফেললেন। গিঁট মুঠির মধ্যে পুরে চুমু খেলেন কয়েকবার।

এতে কী মনিমুক্তা আছে–জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। স্বভাবের সীমানা অতিক্রম করে বললাম, দাদা, আপনার পরিচয়টা জানতে পারি?

–হ্যাঁ আমি সতীশচন্দ্র দাস। আমার আসল দেশ, বাংলাদেশের মাদারীপুরের সোনাতলী গ্রাম। চৌষট্টির দাঙ্গায় এপার চইলা আইছি। এখন পুরুলিয়ার ফরাশগঞ্জে থাকছি।"

চল্লিশ বছর ভারতের মাটিতে কাটিয়েছেন তিনি। কিন্তু মুখে তার বাঙালের ভাষা। মাদারীপুরের গালিবুলি সবই তার জবানে অক্ষয় হয়ে আছে। সতীশচন্দ্র আমার ঠিকানা জানতে চাইলেন। বললাম, ফরিদপুর।

–আগে কইবেন তো। আমরা তো একই দ্যাশের লোক।

সতীশের দেশের হিসাব আলাদা। এবার আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়ে বললাম, ধুতির গিট্টুতে কী আছে, এতো যত্ন করছেন?

–পোতার মাটি, দাদার পোতার মাটি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সতীশ বললেন, তাইলে আপনারে আসল কথাডা কই। দেশের লোক পেয়ে সতীশ দেশি বুলি আউড়ে যেতে লাগলেন। তখন তার সঙ্গে আমি কখনো মাদারীপুর কখনো পুরুলিয়ায় পরিভ্রমণ করছি।

১৯৬৪ সালের দাঙ্গা যখন শুরু হলো তখন তার বড় মেয়ে দুর্গার বয়স তের কি চৌদ্দ। বড় খারাপ বয়স এটি। দাঙ্গার খবর শুনে ঘাবড়ে গেলেন সতীশ। তখন তার ভরসা বন্ধু রহিমউদ্দিন। এক সঙ্গেই মদনচন্ডির ডাঙ্গি প্রাইমারি স্কুলে পড়তেন তারা। তাদের মধ্যে ছিল গলায় গলায় ভাব। প্রাইমারি পাস করে সতীশ ঢুকল তার বাবার পানের ব্যবসায়, আর রহিমউদ্দিন হালুটি কাজে। তখন দেখা সাক্ষাৎ কম হলেও

বন্ধুত্বে ভাটা পড়ল না। উপরন্তু বন্ধুত্ব গড়াল দুই পরিবারের মধ্যে। তার মেয়ে দুর্গাকে রহিম নিজের মেয়ের মতোই ভালবাসত। সতীশ বললেন, আমাদের বাড়ি আইস্যা রহিম আমারে ডাকত না, দুর্গা মা বলে চিল্লানি দিত। দুর্গা তাকে তালের পাখা নিয়া বাতাস করত। একদিনের কথা হুনেন। দুর্গার বয়স চার বছর ছাইড়া পাঁচে পইড়েছে। রহিমগো বাড়ি থন বেড়াইয়া আইসা কয়, আমার দুইডা বাবা। তুমি আর রহিম কাকু। আমাগো মধ্যে অ্যামন মিলমহব্বত আছিল।

দাঙ্গা শুরুর রাইতে রহিম আইল। কিন্তু সেদিন বাড়িতে আইসা দুর্গা মা বলে চিল্লানী দিল না। কইল, সতীশ বাড়িতে আছোনি! আমি দুয়ার খুইল্যা পিড়ি আগাইয়া দিলাম। সে কইল, দেশের অবস্থা তো ভাল না। সাবধানে থাইকো। আমি খোঁজখবর রাখতাছি। ঝামেলা হইলে খবর দিমু। আর দুর্গার জন্য আমার কতটা পোড়ে তা তো তুমি জানো। ও আপাতত আমাগো বাড়িতে চলুক।

সেই কথা আমিও ভাবতেছিলাম। দুর্গা ওর রহিম কাকার সঙ্গে গ্যালো। হিন্দু মেয়ে মুসলমানের বাড়িতে উঠছে তা রহিমের জন্য বিপদ হইয়া দাঁড়াইল। সবাই কওয়াকওয়ি কইরতে লাগল। পাশের গ্রামে যে দিন হামলা হইল সেদিন রাতেই আমি দোস্তরে কইলাম, তুমি আমার জমি জিরাত লইয়া যা পারো দেও, আমি আর থাকুম না।"

"দোস্তর তো তেমন টাকাপয়সা ছিল না। তাই সেই জমির উদ্দিন বেপারীর কাছে আমার সহায়-সম্পত্তি বেইচ্যা দিল। ন্যায্য দাম পাইলাম না। তারপরও কিছু পাইছিলাম। অনেকেই তাও পাইল না। তারপর এক রাতে দালাল ধইরা পরিবার-পরিজন লইয়া বর্ডার পাড়ি দিলাম।

তারপর শুরু হলো সতীশের নতুন জীবনসংগ্রাম। ঘুরপাক খেতে খেতে পুরুলিয়ায় এক সরকারি খাস জমিতে ঠাঁই হলো। সিপিএম গভর্নমেন্ট আসার পর সেই জমির পাকা বন্দোবস্ত পেয়েছেন। এছাড়া আরো বিঘা দেড়েক মাঠের জমি কিনেছেন। বড় ছেলে মুদির দোকান দিয়েছে। মেজটা রেলে চাকরি করে। ছোট গনেশের জন্ম ভারতের মাটিতেই। সে স্বাস্থ্যকর্মীর চাকরি পেয়েছে। সিপিএমের খাতায় নাম লিখিয়েছে। বয়স কম হলেও পাড়ার লোক তাকে মান্য করে। পাড়া-পড়শির বিপদে আপদে ওর কাছে আসে। পরামর্শ করে। কারও বিপদ হলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুই ভাই বিয়ে করেছে। গনেশ বিয়ে করেনি। তবে পাঁচ বছরের চাকরির টাকা জমিয়েছে সে। সেই টাকা দিয়ে বাড়িতে প্রথম চারচালা টিনের ঘর উঠবে। আর পোতাও পাকা করার ইচ্ছে গনেশের। এরপরই গনেশের বিয়ে। এ ব্যাপারেও ঝামেলা আছে। মুসলমান পাড়ায় ওর যাওয়া-আসা, ওখানেই নাকি এক মেয়ের সঙ্গে ভাব।

সতীশ তাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছেন। কিন্তু গনেশ বলে, আমি জাতপাত মানি না। সব মানুষ সমান। সতীশের খেদোক্তি, কমুনিস্ট হইয়া গ্যাছে মনে অয়।

ঘরের একটা নকশা বানিয়েছে গনেশ। তা যখন সতীশকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল তখন সতীশ বলেন, আজ চল্লিশ বছরের বেশি হইল, দ্যাশের মাটিতে তো যাওয়া হইল না। চোখে ছানি পইড়ছে। আগের মতো দেখতে পাই না। মরার আগে দ্যাশের মাটিতে যাওনের ইচ্ছা কইরতেছে। সেই সঙ্গে ব্যক্ত করেন আরেক ইচ্ছের কথা। নতুন ঘরের পোতায় পৈতৃক ভিটা থেকে এক হাঁড়ি মাটি এনে ছড়িয়ে দিতে চান তিনি।

অতি বাস্তববাদী গনেশের তার বাবার সেন্টিমেন্ট বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাছাড়া তারও পূর্বপুরুষের ভিটা দেখার প্রবল শখ ছিল। তাই গনেশকে সঙ্গে নিয়ে চল্লিশ বছর পর তার বাংলাদেশে ঘুরে আসা।

কিন্তু পোতার মাটি আনা নিয়েই যতো ঝামেলা। বেনাপোল সীমান্তেও মাটির হাঁড়িটি আটকাল। বলল, মাটি আনা বেআইনি। কত জেরা করল তার ইয়ত্তা নেই। তারপর এক কাস্টম কর্মকর্তার হাতে তিনটে দশ টাকার বাংলা টাকার নোট ধরিয়ে দেওয়ার পর মাটির হাঁড়িটি আনার অনুমতি মিলল।

পেট্রাপোল সীমান্তেও একই রকম সওয়াল। তারপর কাস্টম কর্মকর্তা হাঁড়ির ভেতর হাত ঢুকিয়ে তলদেশ থেকে এক মুঠি মাটি এনে পরখ করে দেখল। দ্বিতীয় বার হাত ঢুকাতেই হাঁড়িটি টেবিলের ওপর থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে কয়েক খণ্ড হয়ে গেল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল সতীশ চন্দ্রের কয়েকশ মাইল বয়ে আনা মাটির দানাগুলো। কাস্টম অফিস ঘরের মেঝে থেকে সতীশ হামাগুড়ি দিয়ে তা পরম যত্নে কুড়িয়ে পরনের ধুতির এক কোনায় গিঁট দিয়ে বাঁধলেন।

কাস্টম অফিসার হো হো করে হাসতে লাগল। সে হাসি সংক্রমিত হলো ঘরের ছোট-বড় কাস্টম কর্তাদের ঠোঁটে। সতীশের চোখের জল সবার হাসি থামিয়ে দিল। ভারতীয় বিশ রুপির বিনিময়ে মাটি আনার অভিযোগ খারিজ হলো।

সতীশের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে অনেক কথা। একজন গুণমুগ্ধ শ্রোতা পেয়ে সে কথার ঝুড়ি উগলে দিল। সতীশের দেখা বাংলাদেশ অনেক বদলেছে। সে সময় প্রকাশ্যে কোনো হিন্দু মুসলমানদের বাড়িতে কিংবা কোনো মুসলমান হিন্দুর বাড়িতে খেত না। তবে গোপনে খানাপিনা চালাত। সেও রহিম উদ্দিনের বাড়িতে গোস্ত-রুটি খেয়েছে। এসব কোনভাবে ফাঁস হলে সামাজিক বিচার হতো, এমনকি একঘরে করে রাখা হতো। এখন এমন অবস্থা নেই। সে সাত দিন ছিল। তিন দিন তার মেসত বোনের বাড়িতে, দুই দিন দোস্ত রহিমউদ্দিনের বাড়িতে। রহিমউদ্দিন বেঁচে নেই। তার ছেলেরা তাকে অনেক যত্ন করেছেন। আর একদিন ছিলেন নিজের ভিটাতেই।

সতীশ বলেন, ছমির উদ্দিনের ছেলেরা তার বাপের মতো না। ছেলের বউগুলো ভালো। তারা তার পাতে খাবার তুইল্যা দেছে। তার ছোট পোলাডা, যারে এই পেরথম দেখলাম, সে বিএ পাস। আমারে কইল, ভারতে যামু, তখন কাকু আপনার বাড়ি দেইখ্যা আসব। ও-ই তো চারটি পেঁপে, এক থলে আমড়া দিছে। কইল, এটি

আপনাদের লাগানো গাছের ফল, আপনারই হক।" এসবের একাংশ রেখে এসেছেন। এতদূরের পথ এত সব কি আনা যায়?

এখন হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বেশ সদ্ভাব। তা দেখে সতীশের মনে হয়েছিল যে, সেদিন ঝুঁকি নিয়ে থাকলেই ভাল হতো। তিনি হিসাব মেলাতে পারেন না যে এসে ঠিক করেছেন, না ভুল করেছেন!

সতীশ নিজেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, এখন তো আর পেছনের কথা ভাইবা লাভ নাই। আমার তিন কাল গ্যাছে। সামনের দিনগুলা যেনো ভালোয় ভালোয় কাটে, ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনা করি।

এরই মধ্যে গনেশ এসে হাজির। হাতে তার আরো কয়েকটি পুটুলি। সে দূর থেকেই লক্ষ্য করেছে যে আমি তার বাবার কথা শুনছি।

সে এসে বিনীতভাবে আমাকে নমস্কার করে বলল, আপনি কি বাংলাদেশ থেকে এলেন! বললাম, হু। তারপর তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, ভালো শ্রোতা পেয়েছিলে দেখছি। সব কি বলা হয়েছে? মৃদ হাসলেন সতীশ। তারপর ছেলের সঙ্গে রওনা দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আমার নাম কি তা জানতে চাইলেন।

আমার আরবি ভাষার নাম শুনে বৃদ্ধ সতীশ একটু ধাক্কা খেলেন। বললেন, আপনার কথায় বুইঝতেই পারি নাই আপনি মুসলমান।

একটু ঢোক গিলে সতীশ বললেন, আমি আর হিন্দু-মুসলমানকে আলাদা কইরা দেখি না। তবে দাঙ্গা হওয়ার পর মনের ভেতর ধন্দ তৈয়ার হইছিল। পরে বুঝছি, খারাপ মানুষ দুই জাতের মধ্যেই আছে। যারা বাবরি মসজিদ পোড়াইছে, তাগো কি ভালো মানুষ কওন যায়? আমার গনেশও আমারে সেই বুঝ দিছে। চল্লিশ বছর পর দেশে যাইয়া বাংলাদেশে মুমলমানের যে ব্যবহার পাইছি, তাতে তাগো ওপর আমার আক্রোশ নাই। তয় আমার ঘেন্না অমানুষের ওপর, সেদিন যারা আমারে দ্যাশ ছাড়া কইরাছে।

শিল্পীর নিরুদ্দেশ যাত্রা

চন্দন চলে যাওয়া মাত্রই লঞ্চের কেবিনের সিটকানি এঁটে দিলো শিল্পী। ভাগ্য বলে কিছু আছে—তা মানতে রাজি নয় শিল্পী। মনের অজান্তেই বলে উঠল– ভাগ্যিস, কাল চন্দনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল! না, হঠাৎ করে দেখা হয়নি। গত কয়েকদিনের কথা মনে করে শিউরে ওঠে শিল্পী। কী ভয়াবহ সব ঘটনাই না ঘটে গেছে! এখন ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে লঞ্চে বসে, শিল্পী পেছন ফিরে তাকাল। বিশ্বাস করতে পারছে না এ কী করে তার পক্ষে সম্ভব হলো। রোববার গভীর রাতে কুমারখালীর কৃষককর্মী সোলায়মান তাকে পৌঁছে দিয়েছিল রাজবাড়ীতে। শহরে সোলায়মানের শ্যালিকার ঝুপড়িতে রাত্রিবাস। খুব ভোরে নিজেকে বোরকায় ঢেকে ঢাকার বাসে উঠেছিল। গোয়ালন্দ থেকে বাসে চেপে ফরিদপুরে এসে বান্ধবী মায়াকে খুঁজে না পেয়ে অথৈ বিপদে পড়েছিল।

সেখান থেকে বাসে বরিশাল। রাত তখন ৮টা। বিএম কলেজে গিয়ে নাইটগার্ডের কাছ থেকে চন্দনের ঠিকানা পাওয়ার পর মনে মনে বলল, ইউরেকা! তারপর ঝাউতলায় গিয়ে বাসা পেল; কিন্তু চন্দনকে পেল না। বুদ্ধি করে আগে বোরকাটা পেঁচিয়ে ব্যাগে পুরেছিল। তা না হলে কী করে বলত, চন্দন আমার মেসতুতো ভাই। চন্দনের প্রতিবেশীর কাছে জানল, তার বউ বাচ্চাদের নিয়ে গ্রামে গেছে। চন্দন ফিরবে কখন, কেউ জানে না। কখনও কখনও ফেরে বেশ রাত করে। প্রতিবেশী এক মহিলা বলল, আমার ঘরে এসে বসুন; কিন্তু আপনার ফোন না করে আসা ঠিক হয়নি। শিল্পী মাথা নাড়ল।

রাত ১০টায় চন্দন এলো। পাশের বাসার ছেলেটি বলল, কাকু আপনার মেসোতো বোন এসেছে। চন্দন এসে প্রথমে শিল্পীকে চিনতে পারেনি। অথচ একদিন ওরা মধুর ক্যান্টিনে, শরীফ মিয়ার চায়ের দোকানে, টিএসসিতে কত আড্ডাই না দিয়েছে! ইকবালের কাছের বন্ধু চন্দন, একই সঙ্গে তারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়ত। চন্দনের রাজনীতিতে আগ্রহ ছিল, কিন্তু আকর্ষণ ছিল না। তাই ছাত্রজীবনের পাঠ চুকিয়ে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে গিয়েছিল বরিশাল বিএম কলেজে। ইকবাল আর শিল্পী যোগ দিল সমাজবদলের যুদ্ধে। শুরু হলো ওদের আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতি। সব কিছুই চন্দনের জানা। ইকবাল কুষ্টিয়া থেকে বরিশাল হয়ে ঢাকা যেত। চন্দনের বাসা ছিল তার নির্ভরযোগ্য শেল্টার।

বহুদিন চন্দনের সঙ্গে দেখা নেই। তাছাড়া গত ক'দিনের ধকলে শিল্পী অনেক বদলে গেছে। শিল্পী বলল– দাদা, চিনতে পারছো না, আমি তোমার মেসোতো বোন, শিল্পী।

চন্দন ওর মেসোতো বোনের অভিনয়ের জের টেনে বলল– ও, তুই কত বদলে গেছিস! তোর বৌদি গ্রামের বাড়িতে। নিজে রান্না করে খেতে হবে কিন্তু। শিল্পী ঠিক আছে বলে ম্লান হাসল। প্রতিবেশিনী বলল, খবরদার আমার বোনটিকে রান্নাঘরে পাঠাবেন না, আমি খাবার পাঠাচ্ছি। যেতে যেতে শিল্পী বলল, আমি আপনাকে লজ্জায় ফেললাম।

–আরে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে ভাত-তরকারি এলো। চন্দন বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে। শিল্পী রাখঢাক না করে খেয়ে নিল। তারপর বলল– চন্দনদা, পত্রিকায় দেখেছেন?

চন্দন সকালেই দেখেছিল খবরটা। কুষ্টিয়ার জনযুদ্ধ বাহিনীর নজীব-উদ-দৌলা খুন হয়েছে।

–হ্যাঁ, আমি তোমার খাওয়ার আগে কথাটি তুলতে চাইনি। তোমাদের ওপর দিয়ে অনেক বিপদ যাচ্ছে।

চন্দনদা, আমার দিকে তাকান। আমি ওকে খুন করেছি।

–কী বলো তুমি?

–হ্যাঁ হ্যাঁ আমিই, আরও শুনুন, ওই কুলাঙ্গারটাই ইকবালকে খুন করেছে।

–ইকবাল বেঁচে নেই?

–না, আমি খুনের বদলা নিয়েছি।

চন্দন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। এই কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই শান্ত মেয়ে শিল্পী, যে চড়ুইপাখির মৃত্যুতে মন খারাপ করত! আজ সে কত বদলে গেছে...।

–তাকিয়ে কী দেখছেন? আমি পাগল হয়ে যাইনি। পাগল হলে কি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে পালাতে পারতাম!

শিল্পী একাই কথক। চন্দন শুনছে।

–আপনি জানেন, আজ থেকে দুই বছর আগে কুষ্টিয়ার মুক্ত এলাকায় হাজির হই। কমরেডরা আমাকে স্বাগত জানাল। ইকবালের সুন্দরী প্রেমিকার কথা পুলিশ-জনতা কারও কাছে গোপন রইল না। আমার উপস্থিতি জনযুদ্ধ ফৌজে আনল বাড়তি আকর্ষণ। আমি হলাম কমরেড শিখা।

নজু মানে নজীব-উদ-দৌলাকে ইকবাল না চিনলেও আমি চিনেছিলাম। মাস্টার্সের রেজাল্টের পর আমার কলেজে চাকরি হলো। যেদিন যোগ দেওয়ার কথা, ওইদিন ইকবাল এলো। বলল, খবর আছে। মানিকদা, কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রস্তাব রেখেছেন, মুক্ত এলাকায় নারীদের সংগঠিত করার জন্য একজন সার্বক্ষণিক সংগঠক দরকার। উনি তোমার নাম প্রস্তাব করেছেন। কমরেড নজু, যিনি বাহিনীর প্রধান এবং দলের দ্বিতীয় ব্যক্তি, তিনি সমর্থন করেছেন। অতএব, সিদ্ধান্ত ফাইনাল।

আমি বললাম, তোমাদের কমরেড নজুকে আমার পছন্দ হয় না। ঢাকায় অনুষ্ঠিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় নজুকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছিলাম আমি। সে সময় তার আচরণ পছন্দ হয়নি আমার। তখনও ইকবালকে বলেছিলাম, লোকটা যেন কেমন। ইকবাল বলল, তৃণমূল থেকে উঠে আসা কমরেড, শহুরে আচরণের মাপকাঠিতে তাকে মাপা যাবে না।

ও বলল, শিল্পী তোমার একটাই অভ্যাস, যাকে তোমার একবার পছন্দ হয় না, তাকে আর কোনোদিন পছন্দ করতে পারো না। আমি হেসে বললাম, ঠিক আছে বাপু, কমরেড নজু জিন্দাবাদ।

আমি যাওয়ার কিছুদিন পর আমাদের পার্টিপ্রধান মানিকদার লাশ পাওয়া গেল ঈশ্বরদী রেললাইনের পাশে। সেখান থেকে আমাদের আর্মড স্কোয়াড লাশ এনে বিপ্লবী গান স্যালুট দিলো। তারপর তা গোপন স্থানে সমাহিত করা হলো। ইকবাল বলল, বিপ্লবের পর আমরা ওখানে স্মৃতি জাদুঘর গড়ব। মানিকের মৃত্যুর জন্য প্রতিপক্ষ বিপ্লবী পার্টিকে দায়ী করা হলো। ওই দলের কয়েকজন সদস্যকে হত্যাও করা হলো। মানিকদার মৃত্যুর পর নজু হলেন পার্টি ও বাহিনী উভয়েরই প্রধান।

চাঁদা ও মুক্তিপণ আদায়ে নজু ছিল সিদ্ধহস্ত। সেসবের হিসাব দেওয়ার ক্ষেত্রে ছলচাতুরি ছিল। শোনা গিয়েছিল, ঢাকা ও কক্সবাজারে নজু বাড়ি করেছে। মানিকদা কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় নজুর সমালোচনা করেছিলেন। তাকে কমান্ডারের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ভাবনাও ছিল তার। এরই জের হিসেবে মানিককে প্রাণ দিতে হলো। এ নিয়ে কানাঘুষা চললেও কমিটিতে তা তোলার সাধ্য ছিল না কারও।

কিছুদিনের মধ্যেই কমরেড নজুর বিরুদ্ধে ইকবাল অপবাদ ছড়াচ্ছে বলে একজন সদস্য অভিযোগ আনল। কিন্তু নজু অভিযোগকারীকে শাসিয়ে দিয়ে বলল, এটি অবিশ্বাস্য। ইকবাল এ ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে না। তবে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে তা খতিয়ে দেখা উচিত। নজুর আজ্ঞাবহ মোটামাথার এক ব্যক্তি রহমত আলী। এটি খতিয়ে দেখার জন্য তাকে দিয়ে এক সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হলো।

আমাকে ইকবালের অবস্থান থেকে দূরে পাঠানো হলো। আমাদের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। ইকবাল হয়ে উঠল প্রতিবাদী। কেন্দ্রীয় কমিটির তলবি সভার জন্য যোগাযোগ শুরু করল। ও বলল, এই বদমাশকে আমি ছাড়ব না।

তার আগেই কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ডাকল নজু। সভায় ইকবালকে ডাকা হলো না। পরে জেনেছি, ইকবালকে আটকে রেখে এই সভা ডাকা হয়েছিল। কোরাম হওয়ার মতো সদস্য উপস্থিত ছিল না। সভায় ইকবালের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হলো। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তা কার্যকর করার কথা জানানো হলো। কী বিস্ময়কর, বিপ্লবের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ইকবালকে খুনের পরোয়ানায় কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পেল না! সাচ্চা কমরেডরা হয়ে পড়ল অসহায়। রাজনীতি হলো অস্ত্রের কাছে জিম্মি।

পরেরদিন প্রতিবিপ্লবী ঘটনার জন্য ইকবালের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে, ভোজসভা দিয়ে তা জানানো হলো। তবে বিগত দিনে তার বিপ্লবী ত্যাগের উল্লেখ করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হলো। নজু বলল, তিনি ছিলেন সত্যিকার বিপ্লবী। তিনি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, এজন্য তাকে প্রাণ দিতে হলো। হুশিয়ার করে দিল, এমন বিভ্রান্তি কারও মধ্যে দেখা দিলে তা বরদাশত করা হবে না। ইকবালের সহযোগী তিনজন ভুল স্বীকার করায় তাদেরকে ক্ষমা করা হলো।

আমি ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগে কিছুই জানতাম না। তবে ভয়াবহ কিছু যে ঘটতে যাচ্ছে, তা আন্দাজ করছিলাম। অনেক চেষ্টা করেও ইকবালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না।

আমার বুঝতে দেরি হলো না যে, আমার প্রতি নজুর লোলুপ দৃষ্টিই ইকবালের মৃত্যুর প্রধান কারণ। তা না হলে ইকবালকে হয়তো দল থেকে বহিষ্কার করা হতো। একদিন পর নজু শেল্টারে হাজির হয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিল। ইকবালের জন্য দুঃখ প্রকাশও করল। বলল, পার্টিতে ইকবালের মতো শিক্ষিত তাত্ত্বিকের প্রয়োজন ছিল...।

নজুর তর সইল না। সাতদিনের মাথায় আমাকে জীবনসঙ্গিনী করার প্রস্তাব দিল। বলল, আমার স্ত্রীকে ছয় মাস আগেই তার প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতা ও আচরণের জন্য ত্যাগ করেছি। এও বলল, যখন ইকবাল নেই, তখন তুমি তো একা থাকতে পারো না।

আমি বুঝতে পারলাম, পালানোর পথ নেই। সময় চাইলাম। সময় মঞ্জুর হলো। কিন্তু চাপ বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমি সম্মতি দিলাম। বিয়ের এন্তেজাম শুরু হলো, যদিও তা হবে গোপনে কোনো এক শেল্টারে। বিয়ের আগেরদিন নজুর মোটরসাইকেলের পেছনে বসে কুমারখালী যাচ্ছিলাম। পথে প্রকৃতির ডাকের কথা বলে সাইকেল থামাতে বললাম আমি। নির্জনে গিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে সাইকেলের পেছনে উঠলাম। তারপর ওর মাথা নিশানা করে পিস্তলের ট্রিগারে হাত দিলাম। ওকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে আখক্ষেতের আইল দিয়ে এক কৃষককর্মীর বাড়িতে গেলাম। তারপর গোয়ালন্দ-ফরিদপুর হয়ে আপনার এখানে এসেছি...।

এখন ঘুমাও, বলে চন্দন পাশের রুমে চলে গেল। চন্দন ঘুমাতে পারল না। সে বুঝল, শিল্পীরও কেটেছে বিনিদ্র রাত। সকালে চন্দন কলেজে গেল। বিকালে এসে দেখে শিল্পী ব্যাগ হাতে বসে আছে। বলল– আমি যাই, জানি না আর কবে দেখা হবে! চন্দন ওকে লঞ্চে তুলে দিয়ে চলে গেল।

কেবিনে বসে শিল্পী স্মৃতির ছিন্নপত্রগুলো ওল্টাতে লাগল। ও তখন ক্লাস টেনের ছাত্রী, বড় ভাই রানা রহমান বিএ পড়ে। ছাত্র আন্দোলনের কর্মী ছিল সে। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই তার যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের ঘটনা। ছোট্ট একটি ব্যাগ হাতে রানা বাবা ও মাকে সালাম করল। শিল্পীকে কাছে টেনে আদর করে কিছু একটা বলতে গেল; কিন্তু বলতে পারল না। ক'দিনের মধ্যে রানার নাম বাতাসে

ভাসতে লাগল, ও মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার। রানাকে নিয়ে তার কত গর্ব! মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের বোন সে। যারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা আনল, রানা তাদেরই একজন।

একদিন এসএমজি ঘাড়ে করে রানা মাদারীপুর পুলিশ লাইনে অস্ত্র জমা দিতে রওনা হলো, সঙ্গে অন্য বন্ধুরা। রানা বলল, ইচ্ছে ছিল বঙ্গবন্ধুর হাতে অস্ত্র দেব; কিন্তু সে সুযোগ হলো না। পুলিশ লাইনেই অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ। তাতে তার তেমন আপত্তি ছিল, তা নয়। কিন্তু পুলিশ লাইনে গিয়ে তার চক্ষু ছানাবড়া। যে পুলিশ কর্মকর্তা পাকবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস, রানা দেখল, সে-ই মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র গ্রহণ করছে। রানা ঢুকে চিৎকার করে বলল, আমি রাজাকারের কাছে অস্ত্র জমা দেব না। রানা অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এলো, সহযোদ্ধারা তাকে শান্ত করল; কিন্তু সে কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চলে এলো। সেক্টর কমান্ডারের কাছে চিঠি লিখল সে, আমি অস্ত্র জমা দিতে রাজি, তবে রাজাকারের কাছে নয়।

একদিন রক্ষীবাহিনী এসে রানাকে ধরে নিয়ে গেল। তাকে আটকে রাখবে বা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে, এমনটা কেউ ভাবল না। কিন্তু যখন কয়েকদিন কাটল, রানার সন্ধান মিলল না। ক্রমেই সবার ধারণা বদ্ধমূল হলো, রানা আর নেই। যে রানা হানাদার বাহিনীর সঙ্গে একের পর এক সাহসী যুদ্ধ করে বাড়ি ফিরে এসেছিল, সেই রানা স্বাধীন দেশে ষড়যন্ত্রের বলি হলো। ভাইয়ের মৃত্যুতে শিল্পীর জীবন থেকে সব আনন্দ শূন্যে মিলিয়ে গেল। একসময় উচ্চমাধ্যমিক পাস করে শিল্পী ভার্সিটিতে ভর্তি হলো। ভার্সিটির কোনো কিছুই তাকে টানত না।

ইকবালের সঙ্গে পরিচয়ের পর তার জীবন নতুন মোড় নিল। একদিন সে টিএসসির সামনে দিয়ে হলে ফিরছে। শুনল পেছন থেকে কে যেন ডাকছে– শিল্পী, এই শিল্পী। ফিরে দেখে ডিপার্টমেন্টের এক ব্যাচ ওপরের ছাত্র ইকবাল আজাদ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র। একাত্তরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা-সেমিনার, বিতর্কমঞ্চে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি।

– কেমন আছো, শিল্পী?

– জি ইকবাল ভাই, আপনি আমাকে চেনেন?

– তোমাকে সবাই চেনে। এসো চা খাই।

চা খাওয়ার কত প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে ও; কিন্তু ইকবালের প্রস্তাবে না করল না; বরং খুশিমনে টিএসসির সামনে অর্ধনির্মিত দেয়ালের ওপর স্বচ্ছন্দে বসে পড়ল।

ইকবাল কীসব রাজনীতির কথা বলল, শিল্পীর মাথায় ঢুকল না। তবে ইকবালের ব্যবহারে মুগ্ধ হলো সে। দু'দিন পর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মাস্টার্স পরীক্ষার ফল বের হলো। ইকবাল ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। শিল্পী ভাবল, তাকে অভিনন্দন জানানো উচিত, সে কি

খালি হাতে যাবে? অনেক ভেবেচিন্তে একটি ফুলের তোড়া নিয়ে মুহসীন হলে গেল। ইকবালের সঙ্গে দেখা হলো; কিন্তু ওর মুখে ভিন্ন সুর।

বলল, বুর্জোয়া ডিগ্রি মানুষকে ওপরের তলায় ওঠায়, মানুষ করে না। এটি বুর্জোয়া সমাজের অলঙ্কার।

শিল্পী মনের অজান্তেই একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, ওটা আপনি কানে, গলায়, না হাতে পরবেন?

– আমার গায়ে একাত্তরের অলঙ্কার আছে, আর অলঙ্কার পরতে চাই না। এই বলে শিল্পীর হাতটা নিয়ে ওর ঘাড়ের বাম দিকটায় রাখল। শিল্পী কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

– বুঝতে পারছো, জায়গাটা কত শক্ত; এখানে হানাদার বাহিনীর বুলেট ঢুকে আছে। বুঝলে, আমার জীবনের এখন বোনাস টাইম। আর বুর্জোয়া ডিগ্রির মোহে ছুটতে চাই না। এখন সামনে অনেক কাজ, অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ শেষ করার পালা।

সে যেন তার রানাভাইয়ের মতো করে কথা বলছে। একদিন সে রানাকে জিজ্ঞেস করেছিল– ভাইয়া, অস্ত্র কেন রেখে দিলে? রানা বলল, যুদ্ধ করে একটি দেশ পেয়েছি কিন্তু মুক্তি আসেনি। মানুষে মানুষে যে বৈষম্যের দেয়াল, তা স্বাধীন দেশে অক্ষত আছে। এজন্য আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ করতে হবে। সে যুদ্ধে তুইও যোগ দিবি, কী বলিস? সে তার ভাইয়ের গলা ধরে বলল, আমি স্টেনগান চালাব; কিন্তু কাকে গুলি করব? রানা হেসে বলল, তোর বুলেট শ্রেণীশত্রুর বুক ঝাঁঝরা করে দেবে। সেদিন রানা ওকে শ্রেণীসংগ্রামের কথা বুঝিয়েছিল। আজ ইকবালের মুখে রানার কথারই প্রতিধ্বনি।

শিল্পীর মনে হলো, ইকবাল তার চিরচেনা, অতি কাছের বন্ধু।

তারপর থেকে ইকবাল আর শিল্পীর মধ্যে প্রায় প্রতিদিন দেখা, ঘোরাফেরা। ওদের মধ্যে কথা হতো ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিপ্লব মার্কসীয় তত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে। বাদ যেত না সাহিত্য, সঙ্গীত বা শিল্পকলা।

একদিন ইকবাল এক গোপন পাঠচক্রে শিল্পীকে নিয়ে গেল। সেখানেই কমরেড মানিকের সঙ্গে শিল্পীর পরিচয়। পায়ে চপ্পল পরা ছিপছিপে গড়নের লোকটির মুখে কখনও আগুনের ফুলকি, কখনও অমৃত। তার ভক্ত হয়ে উঠল শিল্পী। ইচ্ছে হয় ওর পায়ে হাত দিতে; কিন্তু বিপ্লববাদীদের মধ্যে এই ফর্মালিটির সুযোগ নেই।

ছয় মাসের মাথায় বুর্জোয়া সমাজের সব পাঠ চুকিয়ে মানিকদার হাত ধরে কুষ্টিয়ার নিভৃত গ্রামে চলে গেল ইকবাল, সেখানে চলছে জনযুদ্ধের রিহার্সেল।

যাওয়ার আগে রোকেয়া হলের সামনে এলো। তার স্বপ্নের কথা বলল। বলল, হাসিমুখে বিদায় দাও।

এই প্রথম শিল্পী মুখ ফুটে বলল– তুমি কি জানো, আমি যে তোমাকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না?

– আমিও না, আমরা হাত ধরাধরি করে চলব। সে হবে ভিন্ন ধরনের ভালোবাসা।

এমন সুন্দর দিনগুলো যেন পলকে হারিয়ে গেল। কেবিনের ছাদের দিকে তাকিয়ে শিল্পী নিজের কথা ভাবছে, সে বড় নিঃসঙ্গ। কী নিয়ে বাঁচবে, কী করবে, কিছুই জানে না।

কখনও ইচ্ছে হচ্ছে, সে আবার কুষ্টিয়ায় ফিরে যাবে। মানিক ও ইকবালের পথ ধরে সত্যিকার বিপ্লবী দল গড়ে তুলবে– কিন্তু সেটি কতটুকু সম্ভব? শিল্পী নিজেকে মেয়ে বলে না ভাবলেও দলের অনেকের লোলুপ দৃষ্টি যে তাকে ঘিরে থাকে, তা সে ভালো করে জানে। শত্রু খতমের নামে খুনোখুনি, রক্তপাত কী করে বন্ধ হবে? কী করে অস্ত্রবাজদের সামাল দেবে?

পার্টির লাইন নিয়ে ইকবালের মধ্যে অনেক প্রশ্ন ছিল। শেষ সাক্ষাতের দিন সে বলেছিল, বিপ্লবের নামে এমন নিষ্ঠুরতা চলতে পারে না। এর অবসান হওয়া দরকার। ইকবাল মনে করতো, পার্টিকে গণসংগ্রামের পথে নিয়ে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে বড় বাধা সন্ত্রাসীচক্র, যারা মুক্তিপণ আদায় করছে। চাঁদাবাজি করে অর্থ ও ঘৃণা দুই-ই কুড়াচ্ছে। ইকবাল-শিল্পীর মতো বিপ্লবীরা সেই অর্থের ভাগ পকেটে না পুরলেও ঘৃণার ভাগ পেয়েছে। ইকবালের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছিল শিল্পী। ইকবাল বেঁচে থাকলে সেই পথচলা এখনও সম্ভব হতো; কিন্তু শিল্পীর একার পক্ষে তা কতটুকু সম্ভব?

তার মনে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠচক্রের জালালের কথা। ও আদমজীতে শ্রমিক এলাকায় কাজ করে। গণসংগ্রামের প্রতি ওর বিশ্বাস। তবে কি সে জালালের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, নাকি ব্যক্তিজীবনে ফিরে যাবে? কোনো এক আটপৌরে যুবককে নিয়ে ঘরকন্না আর সন্তান উৎপাদনে নিয়োজিত হবে? ভেবে হো হো করে হেসে উঠল, ওর হাসি শূন্যে মিলিয়ে গেল।

লঞ্চের কেবিনে বসে সে নিজেকে প্রশ্ন করল– শিল্পী, তুমি কি ভুলে গেছো তুমি একজন হন্তারক? পুলিশ-গোয়েন্দারা নজুর মৃত্যুতে হয়তো খুশি; কিন্তু তারা রহস্য উদ্ঘাটনে তৎপর হবে। ওরা নিশ্চয়ই জানতে চাইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী মেয়েটি কোথায়, কী করছে? হয়তো শুনবে যে, ইকবালের মৃত্যুর তিন মাসের ব্যবধানে নজু তাকে জীবনসঙ্গিনী করতে চেয়েছিল। এই খুনের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ভাববে।

পার্টির ক্যাডারদের কাছে এতক্ষণে ঘটনাটি স্পষ্ট হয়ে গেছে। তারা হয়তো ধরে নিয়েছে, শিল্পীই নজুর খুনি। খুনের গল্প এতক্ষণে যে কত ডাল-পালা মেলেছে!

সোলায়মান কি চেপে রাখতে পারবে সে শিল্পীকে রাজবাড়ী থেকে ঢাকার বাসে তুলে দিয়েছে? রাত যতই গভীর হচ্ছে, শিল্পীর আতঙ্ক ততই বাড়ছে। সে জানে না কোথায় যাবে। মালিবাগে বাবা-মায়ের বাসায় যাওয়া কি ঠিক হবে? সেটি হবে পুরো পরিবারের জন্য বড় বিপদ। রানার ঘটনার ধকল মা-বাবা সামলাতে পারেননি। তার ওপর তার নিজের চলে যাওয়া।

কত কথা, কত স্মৃতি আজ তার মনে ভিড় করছে। ইকবালের সঙ্গে তার ঘোরাফেরা মেনে নিতে পারছিলেন না শিল্পীর বাবা। একদিন তিনি বললেন– ইকবাল, তুমি কি ঠিক করেছো, কবে শিল্পীকে ঘরে তুলবে?

– বাবা, আমার ঘর নেই। মানুষের ঘরই আমার ঘর।

– জীবনসঙ্গিনী করবে তো?

–জি, আমাকে কিছু সময় দিন।

ইকবালের বিধবা মায়ের ইচ্ছা ছিল হবু পুত্রবধূকে দেখার। শিল্পী জানে না তিনি ইকবালের মৃত্যুর খবর শুনেছেন কি না।

কেবিনে বসে শিল্পী শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ নেই। মানিকের মৃত্যুর পর ইকবাল শিল্পীকে বলেছিল– কেঁদো না, শোককে শক্তিতে পরিণত কর।

সে আজ ইকবালের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই শক্তি অর্জন করেছে। তাই নজুকে হত্যা করে বিপ্লবের কলঙ্ক ঘুচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন আর কত দূর যেতে হবে, সামনে বহু কণ্টকাকীর্ণ পথ, সে কী করে পাড়ি দেবে?

হুইসেলের শব্দ আসছে। লঞ্চ সদরঘাট টার্মিনালে ভিড়তে দেরি নেই। শিল্পী ছোট ব্যাগে সব গোছগাছ করছে। সে এখনও জানে না– কোথায় যাবে, কী করবে!

ঈদের শাড়ি

হাসপাতালেও ঈদের ছোঁয়া। ক'দিন ধরে ঘষামাজায় দেয়াল-মেঝে ঝকমক করছে। নোংরা তোশকগুলোকে ঢেকে দিয়েছে সাদা ধবধবে চাদর ও বালিশের কভার। রোগীরা পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে বিছানায় উঠে বসেছে। ওয়ার্ডবয়রা ট্রলিতে করে সিটে সিটে পৌঁছে দিচ্ছে ঈদ স্পেশাল নাশতা।

নিত্যদিনের নাশতা শুকনো পাউরুটি ও কলা। আজ নতুন আইটেম যোগ হয়েছে– সেমাই। সেমাইয়ের ঘ্রাণে চাপা পড়েছে ওষুধের মদাগন্ধ। রোগীদের মধ্যে ঈদের আমেজ। কিন্তু নূপুরের মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। তার সারা গায়ে ব্যথা। নড়াচড়া করতে পারছে না। হাতও ওঠাতে পারছে না। পেটের মধ্যে ঢুকে আছে একটি বুলেট। অপারেশন করে ওটি বের করার কথা ছিল। এখন ডাক্তার বলছে, রেখে দেবে। বুলেট পেটে নিয়ে বাঁচতে পারবে, না মরবে, সে আশঙ্কামুক্ত হতে পারে না।

নার্স এসে ওষুধ খাইয়ে গেছে। ওয়ার্ডবয় নাশতার থালাটা দিয়ে বলেছে, বুবু খাইয়া লও। না খাইলে সুস্থ হবা কেমনে? সে বলে, তুমি আমার বোন। আমার বোন মিতালীও তোমার মতো গার্মেন্টে কাজ করে। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে। ছেলেটির কথা বলার ঢং খুব ভালো। ওর প্রতি একটু মায়াও জন্মে গেছে। তবে এইটুকু। এর বেশি নয়। নূপুর জিব কাটে। রঞ্জুর জায়গায় কাউকে ভাবতে পারে না। ওই-ই তার জীবনের সবকিছু। আর আজ রঞ্জুকে না দেখলে তার ভালো লাগে না। রঞ্জু এসে পাউরুটি টুকরো টুকরো করে মুখে তুলে দেয়, তা না হলে ওর খাওয়া হয় না। গতকাল রঞ্জু যখন জোর করে পাউরুটি মুখে ঢোকাচ্ছিল, তখন সে বাগে পেয়ে রঞ্জুর আঙুল কামড়ে ধরেছিল। রঞ্জু তার মুখ টিপে বলেছিল, দুষ্টু।

দুষ্টুর পরে কী?

দুষ্টু মেয়ে?

না, হইল না।

আমার দুষ্টু বউ।

বিয়ে হয় নাই, আবার বউ।

হইব, তুই সুস্থ হইলি আর দেরি করুম না।

নূপুরের মনে পড়ে, ও রঞ্জুকে দেখতে পারত না। রঞ্জু কেন, সব পুরুষ মানুষই ছিল ওর চোখের কাঁটা। শৈশবে তার দেখা দুটি পুরুষের দানবীয় মূর্তি সে ভুলতে পারে না।

নূপুরের মনে আছে, আগারগাঁওয়ের বস্তিতে থেকে তার মা পল্টনের এক বাসায় ঝিয়ের কাজ নিয়েছিল। মা ও মেয়ে ওই বাসাতেই থাকত। বাড়ির মালিক ছলিম চৌধুরী বলেছিল, মেয়েকে নিয়ে নিচের ঘরে থাকবা। খাওয়া-পরা ফ্রি। আর মাস গেলে চারশ' টাকা পাইবা।

বেতনও ঠিকমতো পেত। বাড়ির বেগম সাব দিলদরিয়া মানুষ ছিল। খাওয়া-দাওয়ার কোনো কষ্ট ছিল না। ওই বাড়িতেই সে জীবনে প্রথম গরম পোলাও-মাংস খেয়েছে নূপুর। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়াল লোকটাই। বেগমসাব দিন-রাত হিন্দি ছবি দেখত। দোতলা থেকে নামত না। বাড়ির মালিকের চেম্বার ছিল নিচের তলায়। লোকজন বিদায় দিয়ে সে তার মাকে টেনে নিয়ে যেত। প্রথম যেদিন তার মাকে ডেকেছিল, সে কিছুক্ষণ পর গিয়ে দেখে যে, লোকটা তার মাকে টেনেহিঁচড়ে চেম্বারে ঢোকাতে চাচ্ছে। তার মা কিছুতেই যেতে চাইছে না। বলছে, আপনি আমার বাপের নাহান, আপনারে আমি সে চোখে দেখি...।

কিছুক্ষণ পর তার মা আইস্যা লোকটারে খানিকক্ষণ যাচ্ছেতাই গালাগালি করল। নূপুর বলেছিল– মা, উনি কি তোমারে মারছে? মা কইল– না, আমারে আদর কইরছে। অল্পদিনে সে বুঝতে পেরেছিল, সেই আদরের রহস্য। ওই লোকটার থাবা থেকে ফিরে এসে তার মা কিছুক্ষণ কেঁদে কেঁদে ঘুমাত। সকালে নামাজ শেষে মোনাজাতে বলত, আল্লাহ্ আমারে মাফ কইরা দাও। আমি অসহায়। কী করুম। আমারে ফেইলা সোয়ামিরে তুমি নিয়া গেইল্যা। মেয়েটার মুখ চাইয়া আর কোনো দিক তাকাইলাম না। বিএনপি বস্তিতে ভালোই ছিলাম। বুদ্ধির ভুলে এ কোন দোজখে আইস্যা পড়লাম।

নূপুরের সঙ্গে আলাদা গল্প করার সময় মায়ের ছিল না। মোনাজাতের বয়ান শুনেই সে তার মায়ের জীবন সম্পর্কে ধারণা পেয়েছে। তার মা প্রতিদিনই কিন্তু নতুন প্রসঙ্গ আনত মোনাজাতে। তাদের বাড়ি যে পদ্মার চরে ছিল, তাও সে শুনেছে মায়ের মোনাজাতের বয়ান থেকে।

সে একদিন বলেছিল, মা আমার দেশ দেখার ইচ্ছা হইছে। একদিন আমারে নিয়া দেশে চলো।

মারে, আমাগো দেশ গাঙে খাইয়া ফেলাইছে। মানুষজন সব এদিক-ওদিক চইল্যা গেছে। তুই ছোট থাকতে একবার গেছিলাম।

নূপুরের বয়স তখন ১০-১১। সবই মনে আছে। ওই বাড়ির বড় ছাওয়াল কলেজে পড়ত। সে একদিন ওর মাকে গভীর রাতে ডাকল। সোনাবিবি বলল, কী বাপ? ছেলেটা বলল, আমি তোমার বাপ না। তারপর মাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেল।

সোনাবিবি পরদিন মোনাজাতে বয়ান করল, জানোয়ার একটা আমারে কুরে কুরে খাইতেছে, এখন দুইটা হইছে। নূপুর কখনও এই দুই প্রাণীর সামনে পড়ত না। মালিক যখন কালো মোটরগাড়িতে বাড়ি ফিরত, তখনই নূপুর ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকত। সেই থেকে কালো রঙের মোটর গাড়ি হয়ে উঠল তার কাছে বড় আতঙ্ক।

সোনাবিবি চলে যেতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। পারেনি বেগম সাবের জন্য। সে বলেছে, তোমার কিসের কষ্ট? তার চেয়ে বড় কথা, মাসের সব বেতন ছিল বেগম সাবের কাছে জমা। সেটি বুঝে পাচ্ছিল না। একদিন সোনাবিবি বলল, আমার বাড়ির চর জাগাইছে। দখল নিতে মাতবররকে টাকা দিতে হইব। অফিসের খরচ লাগব। টাকাটা দরকার। সেই টাকা নিয়ে তার মা কামরাঙ্গীরচরে নূপুরের দূরসম্পর্কীয় জোছনা খালার বাড়িতে এলো। খালারে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, বুজি, আমারে আশ্রয় দাও।

আমার ঘরে তোর জায়গা আছে। কিন্তু তুই তো আমারে ঘৃণা করস?

আর ঘৃণা করুম না। আমার দেহেও পাপের বীজ কিলবিল কইরতাছে।

কী হইছে তোর?

আবডালে থেকে নূপুর সব শুনল। সে নতুন যা জানল, তার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, তার মা গর্ভবতী হয়ে পড়েছে।

জোছনা বলল, তোমার রক্ত-মাংস খাইয়া ওটা বাইড়া উঠেছে। রাইখ্যা দাও। না চাইলে আমারে দিয়া দিও। আমার কোলে তো কেউ আইল না।

না বুজি, আমি পাপের ফসল রাখুম না। তুমি আমারে হাসপাতালে নিয়া যাও।

সত্যিই জোছনা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তাররা বলল, এখন আর খালাস করা যাবে না। তারপর কামরাঙ্গীরচরের এক ফকিরের ওষুধ খেয়ে তার মায়ের রক্তবমি শুরু হলো। হাসপাতালে নেওয়ার তিন দিন পর তার মৃত্যু হয়।

সেই থেকে জোছনার কাছে সে আশ্রিত। জোছনা তাকে আদর করে। মায়ের স্নেহ দেয়। কিন্তু একটি আবদার আছে তার। জোছনা বলে, তুই কি বোনঝি হইয়া থাকবি, আমার মেয়ে হবি না?

নূপুর বুঝতে পারে, নিঃসন্তান জোছনার হাহাকার। তাই সে জোছনাকে জড়িয়ে ধরে বলল, মা, আমি তোমার মাইয়া। জোছনাও মাতৃত্বের স্বাদ অনুভব করে।

জোছনা বলে, আমার সব তোরে দিয়া যাব। কামরাঙ্গীরচরে আমার জায়গাও তোরে লিখে দেব।

আমি জায়গার লোভ করি না। তুমি আমারে আশ্রয় দিছো, মেয়ের মর্যাদা দিছো। তাতেই আমি খুশি। প্রতিদিন রাত ৯টায় ঘরে ফেরে নূপুর। বলে, মা, দরজা খোল। তারপর জোছনা ও সে একসঙ্গে রাতের খাবার খায়। জোছনা তার মুখে দু-এক লোকমা তুলে দেয়। যেদিন নাইট ডিউটি থাকে, সেদিন সকালে নূপুর আসে। জিজ্ঞেস করে, মা তুমি রাতে খাইছ?

নারে মা, শরীর ভালো ছিল না, তাই খাইতে মন চাইল না। নিত্যদিনের জবাব।

নূপুর সব বুঝতে পারে। জোছনা আর সে এক তন্ত্রে গাঁথা। অথচ কতজনই না বলেছে, তুমি বড় হলে জোছনা বিবি তোমাকে দিয়ে দেহব্যবসা করাবে। আগে থেকে কাইটা পড়। নূপুরের অজানা নয় যে, জোছনা একসময় কান্দুপট্টির নিষিদ্ধ পল্লীতে ছিল। সেটি তুলে দেওয়ার পরও দেহব্যবসা করে জীবিকা চালাত। সে টাকায় সে এক খণ্ড জমিও কিনেছে। নূপুর তার মাকে দেখে বুঝেছে যে, ইচ্ছা করলেই পাপ থেকে দূরে থাকা যায় না। তাই সে ঝুঁকি নিয়ে থেকেই গেছে। এখন বুঝতে পারে, সে ভুল করেনি।

গার্মেন্টের চাকরি তাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছে। করেছে স্বাধীনচেতা। আর তার চোখ খুলে দিয়েছে ঝুমা। দুনিয়াকে এখন সে খানিকটা বোঝে। ঝুমার ক্লাসে না গেলে সে কি বুঝত, শোষণ কী? কী করে মালিকরা তার শ্রম শুষে নিচ্ছে!

ঝুমা বলেছে, 'একদিন এই সমাজে শোষণ থাকবে না, কেউ না খেয়ে মরবে না, দেশ হবে শ্রমিকের।' ঝুমার ক্লাস থেকে সে আরও শিখেছে– ট্রেড ইউনিয়ন, দরকষাকষি, বুর্জোয়া, সর্বহারা আরও কত কী? ঝুমার পরামর্শে বয়স্ক স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়াও কিছু শিখেছে। নিজের হিসাব নিজেই লিখে রাখে এখন। খবরের কাগজ পড়ে। সে চেনে লেনিনকেও।

একদিন ঝুমার চেয়ারের পেছনে টাঙানো ছবি দেখে সে ঝুমাকে জিজ্ঞাসা করল, ওই ছবির মানুষটা আপনার কি কিছু হয়?

তিনি কমরেড লেনিন। রাশিয়ায় বিপ্লব করে শ্রমিকরাজ কায়েম করে গিয়েছিলেন।

সেই বিপ্লবের গল্প সে শুনেছে। জেনেছে, আমেরিকার কু-বুদ্ধিতে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে। ওর রাশিয়ার মানুষের ওপর রাগ হয়। মনে মনে বলে, সুখে থাকতে ভূতে কিলায়?

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে অতীত রোমন্থন করছে। নূপুর দুই বছরে তিনবার গার্মেন্ট বদল করেছে। প্রথমটা ছেড়েছে সুপারভাইজারের বদদৃষ্টির জন্য। সুপারভাইজার তাকে কত লোভ দেখিয়েছিল। বলেছিল, তোরে ঘরের বউ করে নেব। সোহাগে থাকবি। এতে মন গলেনি নূপুরের। দ্বিতীয় চাকরি বদল করল বিচার না পেয়ে। এক টেকনিশিয়ানের যৌন হয়রানির শিকার হয় সে। বিচার দিয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বলল, যা হয়েছে তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তোমার বদনাম হবে। আমরা ওকে শাসিয়ে দিয়েছি, আর কিছু ঘটবে না। নূপুর জিএম সাহেবের মুখের ওপর পদত্যাগপত্র ছুড়ে দিয়ে চলে এসেছে। ওই জিএম ঝুমা হাসানের সঙ্গে ওর যোগাযোগের কথা জানত। তাই তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেনি, বরং তাকে বুঝিয়েছে। চাকরি না ছাড়ার কথা বলেছে। শোনেনি নূপুর।

তৃতীয়বার চাকরি গেছে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। গেল বছর রহমান গার্মেন্ট ফ্যাক্টরির মালিক ঈদের আগে পাওনা শোধ না করে লে-অফ ঘোষণা করলে শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে আসে।

নূপুর তখন কাজে যাচ্ছিল। সে নিজের ফ্যাক্টরিতে না গিয়ে রহমান গার্মেন্টের কর্মীদের মিছিলে যোগ দিল। সে সর্বদাই লড়াকু। মিছিল চলাকালে পাশ দিয়ে একটি কালো প্রাইভেটকার ধীরগতিতে যাচ্ছিল। নূপুর হাতের লাঠি দিয়ে সজোরে সামনের গ্লাসে আঘাত করল। অন্যরাও যোগ দিয়ে গাড়িটি গুঁড়িয়ে চ্যাপ্টা করে দিল। শুরু হয়ে গেল ভাংচুর।

কালো গাড়ি নূপুরের চক্ষুশূল। সে ছলিম চৌধুরীর জন্য মাকে হারিয়েছে। সেই ছলিম চৌধুরীর গাড়ির রঙও ছিল কালো। সেই থেকে কালো গাড়ি চোখে পড়লে নূপুরের রক্ত টগবগিয়ে ওঠে।

এরপর পুলিশ এসে বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। পুলিশের লাঠির বাড়িতে ধরাশায়ী হয় নূপুর। তখন নূপুরকে রক্ষা করতে গিয়ে বেদমভাবে প্রহৃত হয় রঞ্জু। রঞ্জু কখন মিছিলে যোগ দিয়েছিল নূপুর জানে না। হঠাৎ রঞ্জু দেখল নূপুরের ওপর উদ্ধত পুলিশের লাঠিটা নেমে আসছে। দ্রুত ছুটে গিয়ে সে লাঠিটা ছিনিয়ে নেয়। তারপর পুলিশের সব আক্রোশ পড়ল রঞ্জুর ওপর। আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। তার মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোয়। সে দৃশ্য ভুলতে পারে না নূপুর।

রঞ্জুও ঝুমা হাসানের নেতৃত্বাধীন গার্মেন্টকর্মী সংঘের সদস্য। আহত হওয়ার দু'দিন আগে এক কর্মিসভা শেষে চা-নাশতার সময় রঞ্জু ফিসফিস করে নূপুরকে বলল, তুমি খুব সুন্দর, সিনেমার হিরোইনের মতো। নূপুর নিজের সৌন্দর্য নিয়ে গোপন অহঙ্কার ছিল। কিন্তু জবাবে দু-চারজনকে শুনিয়ে সে বলল, ওই যে লাঠিটা দেখছ, ওটা দিয়া মাথা ফাটায়া দিমু।

তার ৪৮ ঘণ্টা ব্যবধানে নূপুরকে রক্ষা করতে গিয়ে পুলিশের আঘাতে রঞ্জুর মাথা ফাটল।

তখন হাসপাতালে রঞ্জুর সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব নিয়েছিল নূপুর। এ জন্য ৭ দিন ফ্যাক্টরি থেকে ছুটিও নিয়েছিল। রঞ্জু জ্ঞান ফিরে দেখেছিল, তার পাশে নূপুর। তখন রঞ্জুর চোখে জল, নূপুর ওড়না দিয়ে তা মুছে দেয়।

পরের দিন রঞ্জু কিছুটা সুস্থ হলে নূপুর বলে, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। আমার জন্য তোমার মাথা ফাইটেছে।

'আরে না, পুলিশে ফাটাইছে, তোমার কী দোষ?'

সেই হাসপাতাল থেকেই তাদের হৃদ্যতা। একদিনের ঘটনা মনে পড়লে লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে রঞ্জুর হাত ধরে বসেছিল। এমন সময় ঝুমা হাসান এসে দাঁড়ায়। সে মোটেই দেখতে পায়নি।

ঝুমা বলে, কী খবর তোমাদের?

আচমকা ঝুমার কণ্ঠ শুনে সে ভড়কে যায়। রঞ্জুর হাত ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তাকিয়ে দেখে, ঝুমা মিষ্টি করে হাসছে। সে হাসি অর্থবোধক।

এক বছরে তারা অনেক বোঝাপড়া করেছে। ঈদের পরই বিয়ে করবে এমন সিদ্ধান্ত ছিল। প্রস্তুতিও চলছিল।

কিন্তু বোনাস না দেওয়ায় আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গার্মেন্ট কারখানাগুলো। তেজগাঁও, টঙ্গী, আশুলিয়া মিছিলে হয় একাকার। সেই মিছিল থেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে নূপুর।

গেল ঈদে রঞ্জু ছিল হাসপাতালে, পাশে ছিল নূপুর। আর এবার নূপুর হাসপাতালে, পাশে রঞ্জু।

রঞ্জুর জন্য তার অধীর অপেক্ষা। এক গাল হাসি মুখে রঞ্জু হাজির হলো। প্রথমেই নূপুর জিজ্ঞাসা করল– তোমার হাতে ওটা কী?

ঈদের শাড়ি, তোমার জন্য কিইন্যা আনছি।

সে প্যাকেট খুলে শাড়িটি বের করল। জরি দেওয়া লাল টকটকে শাড়ি।

পছন্দ হইছে?

হুম। আমার কি অই শাড়ি পরার সুযোগ অইব? বুলেটটা তো এহনও গুতাইতেছে।

অইব। চিন্তা কইরো না, সুস্থ হয়ে উঠবা।

রঞ্জুর হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে নূপুর বলল, তুমি একটা কথা রাখবা?

কও।

আমি যদি মরে যাই, তাহলে তুমি আমারে সাদা কাফনের কাপড় পরাইবা না, এই লাল ঈদের শাড়ি কাইট্যা কাফন বানাইবা।

রঞ্জু বাকরুদ্ধ। কিছুই বলতে পারলো না...।